লোকউৎসব ও লোকদেবতা প্রসঙ্গ

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী

পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন । কলকাতা-৭০০ ০০৯

শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্রকিশোর সরকার

ও

শ্রীযুক্তা দীপিকা সরকার

শ্রদ্ধাভাজনেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই :

সাহিত্য সমীক্ষা

টডের রাজস্থান ও বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যে বঙ্গেতর ভারত

বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস

বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র

লোক সংস্কৃতি : নানা প্রসঙ্গ

লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার (২য় সংস্করণ)

নিবেদন

এখন থেকে ঠিক আঠার বছর আগের কথা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে মেদিনীপুরের বেল পাহাড়ীতে ক্ষেত্রানুসন্ধানের জন্য যে দল গঠন করা হয়, তার অন্যতম সদস্য রূপে প্রথম গ্রাম বাংলার লৌকিক দেব-দেবী এবং উৎসব সম্পর্কে কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটে। এরপর ১৯৬৭-তে পুরুলিয়ার কুইলাপালে একই উদ্দেশ্যে যাবার সুযোগ হয়। এরপর দীর্ঘদিন ধরে গ্রাম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমাদের দেশের অপরিচিত, বিস্মৃত প্রায় এবং সেই সঙ্গে কিছু কিছু জনপ্রিয় উৎসবাদি ও দেব-দেবী সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করি। যদিও বাংলার লৌকিক দেব-দেবী এবং উৎসব নিয়ে একাধিক গ্রন্থ ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, তবু বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশ করার প্রেরণা অনুভব করেছি দ্বিবিধ কারণে। প্রথমতঃ নিজের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশের তাগিদে। দ্বিতীয়ত, যেসব উৎসব বা দেব-দেবী মোটামুটিভাবে অনালোচিত থেকে গেছেন তাদের সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠকদের কৌতূহল নিরসনের উদ্দেশ্যে। কিছু কিছু বিষয়ে আপাতভাবে অন্যান্য গ্রন্থভুক্ত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বলে মনে হতে পারে বর্তমান গ্রন্থে, কিন্তু সচেতন পাঠক লক্ষ্য করতে পারবেন, বিষয়গত সাদৃশ্য থাকলেও তথ্যগত সাদৃশ্যকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে চেষ্টা করা হয়েছে নতুন তথ্যাদির সংযোজনে। গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলির অধিকাংশই 'সত্যযুগ', 'ধনধান্যে', 'পশ্চিমবঙ্গ' এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

জানুয়ারী, ১৯৮৪

বরুণকুমার চক্রবর্তী

বিষয়সূচী

বাঁকুড়া

সাত বৌনি

বাঁকুড়ায় এক লৌকিক দেবী আছেন যাঁর পরিচিতি 'সাত বৌনি' নামে। অবশ্য এই দেবী সংখ্যায় একজন নন, সংখ্যায় সাত। সাতটি বোনকে একত্রে সাতবৌনি বলে বলা হয়ে থাকে। মোট সাতটি পৃথক পৃথক স্থানে এই সাত বৌনিদের অবস্থান। সাতটি স্থানের একটি হ'ল ব্রাহ্মণডিহা। স্থানটি বাঁকুড়ার অন্তর্গত রাইপুরের সারেঙ্গার কাছে। আর একটি স্থান হ'ল নছিপুর। এটি মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার সীমান্তে অবস্থিত।

সাতবৌনির পৃথক কোন মূর্তি নেই। যেখানে পূজা হয় অর্থাৎ পূজাস্থান হ'ল কোন একটি বড়ো গাছের তলদেশ। সেখানে মাটির বেদীর ওপরে দেখতে পাওয়া যায় মাটির তৈরী হাতী, ঘোড়া, মালা এবং ত্রিশূল। তাছাড়া একটি বড়ো মূর্তির মধ্যে থাকে বিভিন্ন ধরণের সাপ এবং ঠাকুরের প্রতীক। পূজাস্থানে বেদীতে একটি গর্তের মধ্যে ভাঁড় বসান থাকে। তার ওপরে থাকে পঞ্চ পল্লব, লাল গামছা এবং লাল শালু।

সাতবৌনি পূজার সময় হ'ল পৌষ সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু করে পরের ছয়দিন। এক একদিন এক এক জায়গায় পূজা এবং সেই উপলক্ষ্যে মেলাও বসে। মেলাতে সব সম্প্রদায়ের লোককেই অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। পূজা এবং মেলা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন গ্রাম থেকে মানুষ ধামসা, ঢাক, ঢোল, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে বাজনা বাজাতে বাজাতে পূজা স্থানে এসে উপস্থিত হয়। তারপর লাঠিখেলা দেখিয়ে ফের বাজনা বাজাতে বাজাতে নিজেদের গ্রামে ফিরে যায়। কোন দলকে আবার হরি সংকীর্তন করতে করতে পূজাস্থানে উপস্থিত হতে দেখা যায়। হরি সংকীর্তন সেরে পুনরায় তারা হরিনাম করতে করতেই নিজেদের গ্রামে ফিরে যায়।

পূজা আরম্ভ হয় সকালবেলা। ঠাকুরের সামনে রাখা ভাঁড় যা নাকি ঘটের মত ব্যবহৃত হয়, তাতে বেলপাতা চাপিয়ে দেওয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই

বেলপাতা পড়ে, ততক্ষণ পুরোহিত পূজা চালিয়ে যান। অনেক সময়ে এইভাবে সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়।

পূজাটি মূলতঃ নিম্ন সম্প্রদায়ের এবং পূজায় কোন ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করেন না। পূজা করেন নিম্নসম্প্রদায়ের মানুষই। সাতটি স্থানের পুরোহিত সাত-জন। এঁরা বংশানুক্রমিক ভাবেই পৌরোহিত্য করে আসছেন। উল্লেখযোগ্য—সাতবৌনির সাতটি পৃথক পৃথক জায়গায় যে পূজার স্থান রয়েছে, এই স্থানগুলি কিন্তু উচ্চ বর্ণের মানুষদেরই দেওয়া। পুরোহিতরা এইসব স্থান বংশানুক্রমিক ভাবে ভোগ দখল করে আসছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, পুরোহিতের মৃত্যু হলে সকল ক্ষেত্রেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কিন্তু পুরোহিত পদে বরণ করে নেওয়া হয় না। একাধিক সন্তান থাকলে নানা বিচারে যোগ্যতম বা উপযুক্ততম পুত্রকেই পৌরোহিত্যের অধিকার দান করা হয়। যোগ্যতা যাচাই হয় 'ভর' ইত্যাদির মাধ্যমে।

এইবার উল্লেখ করা যেতে পারে পূজার উপকরণ ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে। পূজার উপকরণে লাগে আতপ ও সিদ্ধ দুই প্রকারের চাল। শালুক ফুল, বেলপাতা, মাটির তৈরী ছোট ছোট ঘোড়া ও হাতী এবং চাঁদমালা। তাছাড়া বলিদানের জন্য প্রয়োজন হয় ছাগল ও পায়রার।

সাতবৌনি পূজার উদ্দেশ্য হ'ল হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষালাভ। তাছাড়া যে সব শিশু 'পুনা' রোগের শিকার, তাদের দেবীস্থানে আনা হয়। তারপর দেবীর পূজাস্থানের নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রবাহিত নালা থেকে জল এনে পুরোহিত মন্ত্র পড়ে শিশুর গায়ে ছিটিয়ে দেন। এতে নাকি শিশু নিরাময় হয়ে ওঠে। তাছাড়া সন্তানহীনা বন্ধ্যা রমণী দেবীর কৃপায় লাভ করেন সন্তান—এই বিশ্বাসও প্রচলিত।

অনেকেরই ধারণা বিভিন্ন বনাঞ্চল থেকে পূজার দিন হিংস্র জন্তুরা দেবীর কাছে এসে বলিদানের রক্ত পান করে যায়।

যারা প্রত্যক্ষভাবে পূজায় অংশ গ্রহণ করেন তাঁরা পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপবাসী থাকেন। অন্যান্যরা পূজার দিনে মদ্য মাংসাদি আহার করে। মহিলারাই অধিক সংখ্যায় ব্রতিনী হয়ে থাকেন। সাতবৌনির মেলা বসে দুপুরবেলা আর সন্ধ্যার পূর্বেই তা ভেঙ্গে যায়।

ভেঁপু পূজা

ভেপু বা ভেঁপু গৃহদেবতার পূজা। ইনি হলেন পুরুষ দেবতা। অবশ্যই লৌকিক দেবতা। সাঁওতাল ও বাউরীরা এই পূজা করে থাকেন। বসতবাটীর প্রধান কক্ষের ঈশান কোণে ঘটস্থাপন করে এই পূজা করা হয়। পূজারী অব্রাহ্মণ। যে পাড়ায় পূজাটি হয়, সেই পাড়ার বড় কর্তা পূজায় পৌরোহিত্য করেন। ইনি সাঁওতাল বা বাউরী সম্প্রদায় ভুক্ত হন। পূজারীকে পূজার দিন উপবাস করে থাকতে হয়। পূজা শেষ হয়ে গেলে অবশ্য তখন পূজারী খেতে পারেন। পূজার উপকরণ হ'ল আতপ চাল, সিঁদুর ও চালের গুঁড়োর সাহায্যে প্রস্তুত পিঠা। পূজা অনুষ্ঠিত হয় সন্ধ্যাবেলা। ১৫ই কার্ত্তিক থেকে ১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে কৃষ্ণ পক্ষের যে কোনও দিন পূজাটি করা হয়। তাছাড়াও বৎসরের মধ্যে কৃষ্ণপক্ষের যে কোনও দিন সন্ধ্যাবেলা এই পূজাটি করা হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের এই পূজায় অংশগ্রহণ করা অথবা চাক্ষুষ করা নিষিদ্ধ। পূজারী তাঁর নিজের মত করে নিজস্ব ভাষায় পূজা করেন। এই লৌকিক দেবতাটি অনার্য। পূজার নির্দিষ্ট কোন মন্ত্র নেই। লোক-বিশ্বাস এই যে, এই দেবতার পূজা করলে গৃহপালিত পশু হারিয়ে যায় না অথবা তাদের কোনরূপ ক্ষতি হয় না। পূজায় কোন বলিদান হয় না। এমনকি কোনপ্রকার বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহৃত হয় না। পূজায় অংশ গ্রহণ করেন কেবল নারীরা। বাঁকুড়া জেলার নড়রা কঠিয়ার নিকটবর্তী সাভানপুরের কাছে একটি সাঁওতাল পল্লীতে এই পূজাটি অনুষ্ঠিত হয়।

ধান ডাকা

প্রতি বছর আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি তিথিতে সকাল বেলায় গৃহস্থের প্রধান মুনিষ বাড়ী থেকে তিনটি শরডাল অথবা ৭।৯টি শাল ফোড়, কিছু আতপ চাল ও একটি নামাবলী নেয়। যেক্ষেত্রে গৃহস্বামী স্বয়ং বৈশ্য অথবা শূদ্র বংশোদ্ভূত, সেক্ষেত্রে মুনিষের পরিবর্তে গৃহস্বামীই এইসব উপকরণ নেয়। বাড়ীর গিন্নী গায়ে ছিটিয়ে দেন আতপ চাল বাটা। মুনিষকে কিছু রৌপ্য নির্মিত অলঙ্কার

পরান হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মুনিষরা সাধারণত বাউরী সম্প্রদায়ভুক্ত হয়। যাইহোক এরপর মুনিষ গিয়ে উপস্থিত হয় গৃহস্বামীর ক্ষেত্রে। এই সময় সে সম্পূর্ণভাবে নীরবতা অবলম্বন করে। ধান ডাকার অর্থ হ'ল ধানকে ডাকা। কিংবা বলা চলে ফসলের দেবী লক্ষ্মীদেবীকে আহ্বান করা। মুনিষ বাড়ী থেকে যে শালগাছের ফোঁড় ইত্যাদি নিয়ে যায়, তা নিয়ে যায় মাথায় করে। ক্ষেতে উপস্থিত হয়ে সে আতপ চালগুলি মাঠে ছড়িয়ে দেয়। তখন ক্ষেত থাকে ধানগাছে পূর্ণ। আতপ চালগুলি যখন যে মাঠে ছড়ায়, তখন সে মুখে বলতে থাকে—

'লোকের ধান হুলুম থুল, আমার ধান শুধুই ফুল
ধান—ফুল ফুল ফুল।'

—কথাগুলি তিনবার উচ্চারণ করে সে। এরপর ক্ষেতের ঈশান কোণে সে একটি শর পুঁতে দেয়। শরটি পোঁতা হয় খাড়াখাড়িভাবে। এরপর সে ফিরে আসে গৃহস্বামীর গৃহে। এই প্রত্যাবর্তনকালেও নীরবতা অবলম্বন করতে হয়। গৃহে প্রবেশের পথে সিঁদুর মাখানো একটি আম্রপল্লব সহ ঘট রাখা থাকে। এরপর মুনিষ একটি শর পুঁতে দেয় গোবর গাদায়। এটিও পোঁতা হয় খাড়াখাড়িভাবে। আর একটি শর এইভাবে তুলসী মঞ্চের পাশে রাখা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে রাখা হয় ৭।৯টি কাঁচা শাল ফোঁড় বা কাঠি, যে গুলির গোড়ায় প্রায় চার ইঞ্চির মত ছাল তোলা থাকে কিন্তু ডগার দিকে ছাল তোলা হয় না। পাতাগুলিও রাখা হয় অক্ষত। এগুলিকে তুলসী তলায় রেখে দেওয়া হয়। পরের দিন এইসব শর অথবা শাল ফোঁড়গুলিকে. ঘরের চালে তুলে দেয়। মুনিষকে এ পর্যন্ত উপবাস করে থাকতে হয়। এই পূজার উদ্দেশ্য হ'ল শস্য-দেবীকে আহ্বান করা। বিশ্বাস, এইভাবে শস্যদেবীকে সন্তুষ্ট করা যায় এবং পরিণামে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। তাছাড়া এর ফলে পরিবারেরও সামগ্রিক-ভাবে কল্যাণ সাধিত হয়।

বাঘরাই

বাঁকুড়ায় অন্যান্য লৌকিক দেব-দেবীর সঙ্গে আর একজন পূজিত হন, ইনি হলেন বাঘরাই। বাঘরাইকে দেবী হিসাবেই পূজা করা হয়। অবশ্য যারা এঁর পূজা করে থাকেন, সেই দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত বাউরী সম্প্রদায়ের মানুষের

কাছে ইনি 'বাঘরাই বুড়ী' নামেই অভিহিত হয়ে থাকেন। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত চয়নপুর, গোবিন্দধাম ইত্যাদি গ্রামে বাঘরাই বুড়ীর পূজা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। দেবীর পূজা হয় সাধারণত কোন বেল গাছের তলায়। পূজায় পৌরোহিত্য করার জন্য কোন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না। বাউরী সম্প্রদায়ভুক্ত বয়োজ্যেষ্ঠ কোন এক ব্যক্তি পূজা করে থাকেন। পূজার নির্দিষ্ট উপকরণ হ'ল জল, বিল্বপত্র এবং সিঁদুর। দেবীর কোন বিশেষ মূর্তি নেই। অন্যান্য অনেক লৌকিক দেব-দেবীর মত একটি কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর খণ্ডকেই দেবী কল্পনায় পূজা করা হয়। আগেই উল্লিখিত হয়েছে দেবীর পূজা হয় বেলগাছের তলায়। যে প্রস্তরখণ্ডটির পূজা করা হয়, সেটির মাপ হ'ল দৈর্ঘ্যে ১ ফুট এবং প্রস্থে ৯ ইঞ্চির মতন।

প্রতি বছর আষাঢ় মাসের সাত তারিখে অর্থাৎ অম্বুবাচীর প্রথম দিনে দেবীর পূজার স্থানে বলিদান করার রীতি। বলিদান করা হয় একটি বৃহদাকৃতির শূকরকে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই শূকরটি হয় পুরুষ শ্রেণীর। অর্থাৎ কোন স্ত্রী শূকর বলিদান করা হয় না। এই বলিদানের রীতি থেকেও হয়ত প্রমাণিত হয় যে বাঘরাই দেবতা নন, দেবী। দেবী বলেই তাঁর কাছে কোন স্ত্রী প্রাণীর বলিদান নিষিদ্ধ। বলিদানের পূর্বে কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠান অনুসৃত হতে দেখা যায়। যেমন, বলিদানের পূর্বে শূকরটিকে স্নান করান হয়। শূকর এমনিতেই অত্যন্ত নোংরা স্বভাবের প্রাণী। পূতিগন্ধময় আবর্জনা স্থানে থাকতে ভালবাসে সে। তাই দেবীর কাছে বলিদানের পূর্বে তার সর্ববিধ নোংরা স্নান করিয়ে পরিস্কার করে দেওয়া হয়। তারপর তার গলদেশে সিঁদুর লেপন করা হয়।

বলিদানের পর শূকর-মাংস পাড়ার সকলে ভাগ করে নেয়। এই মাংস দু'তিন ধরে সকলে খায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে বলিদানের জন্য ক্রীত শূকরটি পাড়ার সকলের চাঁদায় কেনা হয়ে থাকে।

বাঘরাইয়ের পূজা বছরের অন্যান্য দিন হয় না, কেবল ৭ই আষাঢ় অম্বুবাচীর দিনটিই দেবীর পূজার জন্য নির্দিষ্ট। আর বলিদানের মাধ্যমেই পূজানুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। এ পূজার উদ্দেশ্য হ'ল অকাল মৃত্যু, অনাবৃষ্টি ও বন্যার হাত থেকে রক্ষা লাভ। পূজার উপকরণ নিয়ে দুই একজন নারী পূজাস্থানে গেলেও পাড়ার অন্যান্য মেয়েরা কিন্তু পূজাস্থানে যান না বা অন্য কোন ভাবে অংশ গ্রহণ করেন না। বাঘরাইয়ের পূজা হয় সকাল বেলায় এবং পূজায় কোন

প্রকার বাজনা বাজেনা। এই পূজার পৃথক কোন মন্ত্র নেই। তবে পূজারী ভক্তিচিত্তে 'বাঘরায় দেব্যৈ নমঃ' মন্ত্রটি কয়েকবার উচ্চারণ করে থাকেন। স্পষ্টতঃই বোঝা যায় এই মন্ত্র উচ্চবর্ণের মানুষদের প্রভাবজাত।

মাহাদনা

বাঁকুড়া জেলার নানা স্থানেই বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবী পূজিত হন। এরকমই একজন হলেন মাহাদনা। এই লৌকিক দেবীর পূজা হতে দেখা যায় বেলেতোড়, ছান্দার, চন্দরপুর ইত্যাদি স্থানে। 'মাহাদনা'র নির্দ্দিষ্ট কোন মূর্তি নেই। ১½ ইঞ্চি × ১ ইঞ্চি মাপের একটি কালো পাথরকেই দেবতাজ্ঞানে পূজার্চনা করা হয়। পূজা করা হয় গাঁদাফুল এবং বেলপাতা দিয়ে। তাছাড়া পূজার সময় প্রস্তরখণ্ডটিতে লেপন করা হয় সিঁদুর। পূজায় নৈবেদ্য আবশ্যিক। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনা। তবে নৈবেদ্যের বৈচিত্র্য উল্লেখ করার মত। ফলমূল এবং মিষ্টান্নের পরিবর্তে শুধুমাত্র আতপ চাল এবং গুড় পূজায় উপচার হিসাবে প্রদত্ত হয়। 'মাহাদনা'র পূজা প্রাত্যহিক ব্যাপার নয়। বৎসরের একটি মাত্র দিন এই লৌকিক দেবীর পূজার জন্য নির্দ্দিষ্ট। আর সেই দিনটি হ'ল মকর সংক্রান্তি। পূজানুষ্ঠান হয় দিনের বেলায়। সাধারণতঃ দুপুরের দিকেই তা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

পূজায় অন্যান্য যে সব উপকরণ ব্যবহৃত হয় তা হ'ল মাটির ঘট এবং আম্র-পল্লব। পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত পৌরোহিত্য করেন যিনি, তাকে উপবাস করে থাকতে হয়। পূজায় যারা অংশগ্রহণ করেন, তাদের দেওয়া হয় প্রসাদ। এই প্রসাদ হল খিচুড়ী। অংশগ্রহণকারীরা পূজার পর সকলে বসে খিচুড়ী প্রসাদ গ্রহণ করে।

এইবার দেখা যাক পূজাটি কাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়ার বাউরী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরাই এই পূজানুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন। এই বাউরী সম্প্রদায় সম্ভবতঃ দ্রাবিড় গোষ্ঠী থেকেই উদ্ভূত হয়েছেন। দেবতা যদিও 'মাহাদনা' নামে পরিচিত, তবু এছাড়াও তিনি 'মাহাদানা' এবং 'মাদানা' নামেও অভিহিত হয়ে থাকেন। অনুমান, শব্দগুলি এসেছে 'মহাদেব' শব্দটি থেকে।

এখন প্রশ্ন হ'ল এই দেবতার পূজা করার কারণটি কি? অন্য সব ক্ষেত্রের

মতন ইহলৌকিক কারণেই এই লৌকিক দেবী অর্চিত হয়ে থাকেন। মাহাদনাকে শস্যদেবী বলে বিশ্বাস করা হয়। গ্রামের মানুষের জীবিকা মূলতঃ শস্যের ওপরই নির্ভরশীল। নানাবিধ প্রতিকূলতায় সেই একান্ত নির্ভর শস্যের হানি যদি ঘটে তাহলে গ্রামের মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন হবার সম্ভাবনা। এইজন্য শস্য রক্ষায় তার আগ্রহ সর্বাধিক। লৌকিক বিশ্বাস অনুযায়ী মাহাদনা মাঠের ফসল রক্ষা করেন। অবশ্য শুধু তাই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে এমন কি চোর ডাকাতের হাত থেকে কৃষকের ফসল রক্ষাতেও এঁর সক্রিয় সহায়তা কামনা করা হয়।

মুটআনা

প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহের বৃহস্পতিবার অথবা শনিবারের সকালবেলায় গৃহস্বামী স্বয়ং যান মুট আনতে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা পাটের ধুতি পরেন ও খালি গায়ে মাঠে যান। সঙ্গে থাকে পূজার সাধারণ উপকরণ। হাতে থাকে একঘটি জল ও একটি নামাবলী। লক্ষ্মীদেবীর পূজা শেষ করে গৃহস্বামী নিজের ক্ষেতে আতপ চাল ছড়াতে ছড়াতে বলে, "লোকের ধান আলফাল, আমার ধান শুধুই চাল"। এই বক্তব্যের পরিবর্তিত পাঠান্তরও শোনা যায় এইরকম—'অন্যের ধান আলথাল, আমার ধান শুধুই চাল।' তিনবার বলার নিয়ম। এরপর ধানক্ষেতের ঐ পূজাস্থানে কয়েকগুচ্ছ ধানগাছ, সংখ্যায় দুই/তিন আঁটি উপড়ে নেওয়া হয়। আঁটিগুলি গোড়াসহ হওয়া চাই। তারপর নামাবলী দিয়ে ঐ ধান গাছগুলিকে বেঁধে মাথায় করে বাড়ীতে নিয়ে আসা হয়। সদর-দরজা থেকে জলধারা দিয়ে গৃহস্বামীকে তুলসীতলা পর্যন্ত গৃহস্থের কুলবধূ বা সধবা কোন গিন্নী—অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসেন।

তুলসীমঞ্চতলার সামনে দুটি বড় আকারের মাড়ুলি দেওয়া থাকে। একটি মাড়ুলির ওপর গৃহস্বামী, যিনি নাকি মুট আনতে গিয়েছিলেন তিনি এসে দাঁড়ান। অপর একটি মাড়ুলির ওপর ঘটটি স্থাপন করা হয় ও ঘটের পাশে ঐ ধানের গোছাটি যা নাকি নামাবলী ঢাকা দিয়ে আনা হয়েছিল, তা নামিয়ে রাখা হয়। এরপর বাড়ীর গিন্নী গৃহস্বামীকে প্রশ্ন করেন আর গৃহস্বামী তার উত্তর দেন এইভাবে—

গিন্নী—লক্ষ্মী ঠাকরুণ কি বললেন ?

গৃহস্বামী—খামার চাঁছতে বললেন।

গিন্নী—লক্ষ্মী ঠাকরুণ কি বললেন ?

গৃহস্বামী—ধান ঝাড়ার পাটা ঠিক করতে বললেন।

গিন্নী—লক্ষ্মী ঠাকরুণ কি বললেন ?

গৃহস্বামী—মরাইয়ের পাটা তৈরী করতে বললেন।

অর্থাৎ গিন্নী প্রতিবার একইরকম প্রশ্ন করেন, কিন্তু গৃহস্বামী তিনবার তিন ধরণের উত্তর দেন। আর এইভাবেই অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

মাঠে পূজা করার সময় কোন মন্ত্রোচ্চারণের প্রয়োজন হয় না। ব্রাহ্মণ পূজারীরও প্রয়োজন হয় না। যিনি মুট বা ধান্যমুষ্টি আনলেন, তাঁকে উপবাসী থাকতে হয় সমগ্র অনুষ্ঠানটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত। দিন কয়েক পরে ঐ ধানগুচ্ছ থেকে ধানগুলি বেছে নিয়ে লক্ষ্মীর হাঁড়িতে রাখা হয়। আর ঐ ধান-গুলির খড়গুলি বাউরী বাঁধার জন্য রক্ষিত হয়। মকর সংক্রান্তির আগের দিনটিকে বলে বাউড়ী। বাউরীর সন্ধ্যায় ঐ খড়গুলিকে দড়ি পাকিয়ে সাত/আটটি টুকরো করা হয়। তারপর ঐ দড়ির টুকরোগুলি গভীর রাত্রে গ্রামের দুর্গা, কালী, চণ্ডী, মনসা মন্দিরে, ঘরে লক্ষ্মী পূজার বেদীতে, কলসীর পাশে, বাক্সের ওপর, দরজার গোড়ায়, খামারে প্রভৃতি জায়গায় রেখে আসা হয়। পরের ভোরে মকর সংক্রান্তির দিন মকর স্নান করতে যাবার সময় ঐ দড়ির টুকরোগুলিকে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর পুকুরে বা নদীতে জলসায় করা হয়। যারা ঐ দড়ির টুকরো নিয়ে স্নান করতে যান, তাদের স্নানকে বলে 'বাউড়ী স্নান', অপর পক্ষে অন্যান্যদের স্নানকে বলে 'মকর স্নান'। 'মুট আনা' অনুষ্ঠানটিকে মা-লক্ষ্মীকে বাড়ীতে আনার অনুষ্ঠানরূপে গণ্য করা যায়।

দেনী আনা

গৃহস্থের মাঠ থেকে ধান তুলে আনার শেষ দিনটিকে দেনি আনা বলা হয়। কেউ কেউ আবার একে দেনী, ডেনি বা ডেনী আনাও বলে থাকে। একটি বিশেষ ক্ষেতের একটি কোণে সামান্য কিছু ধান কাটা বাকি রাখা হয়। জায়গাটির পরিমাপ হবে। ৫´/৬´×৫´/৬´র মত। এই স্থানের ধানগাছ কেটে ঐ দিন কিছু পরিমাণে মাথায় করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে গাড়ীতে করে খামার বাড়ীতে আনা হয়। মাঠে দেনী পূজার স্থানে পূজা করা হয়। ঘি, গুড়,

হরিতকী, সিঁদুর, ঘট, আম্রপল্লব, গাঁদা ফুল, ঘট, শুকনো চিঁড়ে এইসব হ'ল পূজার উপকরণ। গৃহস্বামী বা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র এইসব উপকরণ লক্ষ্মীদেবীর উদ্দেশে নিবেদন করেন। দেনী পূজায় কোন মন্ত্রপাঠ করা হয় না। ব্রাহ্মণেরও প্রয়োজন হয় না। যখন দেনী নিয়ে খামার বাড়ীতে প্রবেশ করা হয়, তখন শাঁখ বাজান হয়। রাত্রে সকলে পিঠে ও পায়েস খান। সন্ধ্যার সময় বাড়ীর মেয়েরা উত্থান থালা, ধূপ, দীপ, শঙ্খ, মূলাফুল, গাঁদাফুল, ঘট, ঘি, গুড, আম্রপল্লব ও ৭/৯টি চালের গুঁড়ির তৈরী রুটি ঘি মাখিয়ে খামার বাড়ীতে নিয়ে যান। একটি পালইযের পাশে যেখানে দেনী আনা ধানগুলি আছে, তার সংলগ্ন স্থানে একটি লাল খুঁটির ওপর ঐ রুটিগুলি রাখা হয়। এরপর পূজার দ্রব্যগুলি খুঁটির গোড়ায় নামিয়ে রাখা হয়। আগে থেকে এই জায়গাটি মাড়ুলি দেওয়া থাকে। প্রজ্বলিত প্রদীপ সহ উত্থান থালাটিকে ৭ বার কিংবা ৯ বার ঐ খুঁটির উপরে স্পর্শ করান হয়। ঐ সময়ে ঘরের মেয়েরা উলুধ্বনি করে ও শাঁখ বাজায়। তারপর মা লক্ষ্মীকে সবাই মিলে একসঙ্গে প্রণাম করে। ঘুমোবার আগে এইদিন রাত্রে সকলেই বিছানায় বসে পায়ে সরষের তেল মাখে। এইভাবে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। এই দিনটি কৃষক পরিবারের খুব শুভ ও আনন্দময় দিন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

জিতাষ্টমী (শেয়াল—শকুনি পূজা) ও ষষ্ঠী পূজা

চান্দ্র ভাদ্র অথবা সৌর ভাদ্র বা আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষে সপ্তমীর শেষ মুহূর্তে এবং অষ্টমীর শুরুতে জিতাষ্টমী পূজা হয়। বাঁকুড়া ছাড়াও এই পূজাটি অনুষ্ঠিত হয় বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়ার বহু গ্রামে। পূজাটি যুগপৎ বৈদিক দেবতা জীমূতবাহন ও লৌকিক দেবী ষষ্ঠীকে লক্ষ্য করে করা হয়। জীমূত বাহনের বাহন হল মেঘ। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী জীমূতবাহন ও ষষ্ঠী দুই ভাইবোন। মতান্তরে স্বামী-স্ত্রী। জিতাষ্টমীর দিন বিষ্ণুপুরস্থিত মল্লরাজ পরিবারে পূজিতা দেবী মৃন্ময়ীর কল্পারম্ভ হয়। কোন কোন বৎসর আবার জিতাষ্টমীর পরের দিনও দেবীর কল্পারম্ভ হয়। জিতাষ্টমী বা তার পরের দিন কল্পারম্ভে মল্লরাজাদের মৃন্ময়ী দেবীর মন্দিরে আসেন বড় ঠাকরুণ নামক দেবী। মান চতুর্থীর দিনে আসেন সেজ ঠাকরুণ আর ছোট, যিনি ষষ্ঠীর দিনে আসেন তিনি ছোট ঠাকরুণ নামে পরিচিতা।

পূজার দিন বিকেলবেলায় গ্রামের কাছাকাছি কোন বটবৃক্ষ থেকে একটি নাতিবৃহৎ বটডাল কেটে এনে বাড়ীর উঠানে পুঁতে দেওয়া হয়। এই বটডালেই পূজা করা হয়। বটবৃক্ষ হল শান্তি ও দীর্ঘায়ুর প্রতীক। এই বটডালটিকে শালুক ফুল দিয়ে সাজানো হয়। বটডালটির গোড়ায় রাখা হয় মানকচু, জয়ন্তী হরিদ্রা ও ধানের চারা। এই গাছগুলিকে শিকড়সহ রাখা হয়। লোক বিশ্বাস এগুলি দেবী দুর্গার আগমনের পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। তাছাড়া এগুলি দেবী ষষ্ঠীরও প্রিয়।

জীমূতবাহন বৈদিক দেবতা। এঁর পূজারী হন ব্রাহ্মণ। পূজার সময় হল প্রদোষকাল। অবশ্য সন্ধ্যার পরও পূজা হতে যে দেখা যায়না তা নয়। দেবী ষষ্ঠীর কাছে কামনা করা হয় সন্তান, অপরপক্ষে জীমূতবাহনের কাছে কামনা করা হয় সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং নীরোগ দেহ। এই পূজায় অংশ গ্রহণ করেন গিন্নী বধূ এবং কুমারী মেয়েরা। শিশু এবং কিশোরদেরও পূজাস্থানে ভিড় করতে দেখা যায়। পূজাব সমস্ত উপকরণ সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ডালায় করে। পূজার উপকরণ বলতে ধূপ, দীপ, গঙ্গামাটি, বেল পাথর, ছোট আয়না, চিরুনী, দূর্বা, মধু, ঘি, দই, তুলসীপাতা, তিল, যব, আম্র পল্লব, সিঁদুর, ঘট, ফুল, চন্দন, হরিতকী, জায়ফল, শঙ্খ ইত্যাদি। প্রসাদ হিসাবে দেওয়া হয় ভিজে ছোলা বা মটর ভিজা।

পূজার জায়গায় প্রদীপ থেকে কাজল তৈরী করে পরস্পরের চোখে পরায়। মাটির তৈরী শেয়াল, শকুনি কাঁচা অবস্থাতে শাল পাতার ঠোঙ্গা করে পূজাস্থলে ব্রতীরা নিয়ে আসেন। ব্রতীরা সারাদিন ও সারারাত উপবাসে থাকেন। পরের দিন বটের ডালটি ভাসানো হলে নদী বা পুকুর ঘাটে ব্রতীরা কলা, দই, চিঁড়ে খেতে পান। হলুদ কাপড়ের টুকরো দিয়ে শেয়াল শকুনিগুলি ঢাকা দেওয়া থাকে। প্রতি ঠোঙ্গায় এক জোড়া করে শেয়াল শকুনি রাখা হয়। এই দুটি জিনিসকে পূজার আগে পরান হয় কাজল ও সিঁদুর। পূজায় বয়স্ক পুরুষ মানুষের উপস্থিতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। পূজায় দূর্বাসহ অর্ঘ্যদান করার মন্ত্রটি হ'ল এইরকম—

ত্বং দূর্বেহমৃত নামামি বন্দিতাসি সুরাসুরৈঃ।
সৌভাগ্য সন্ততিং দত্বা সর্ব্ব কার্যকরী ভব।
যথা প্রশাখাভিবিস্তৃতাসি মহীতলে
তথা মমাপি সন্তানং দেহি ত্বমজরামরণম্ ॥

শেয়াল, মৃত্যু ও শকুনি অশুভের প্রতীক। মৃত্যু ও অশুভের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য শেয়াল ও শকুনিকে পূজা করা হয়। বলাবাহুল্য এদের সন্তুষ্ট করা হয় এইভাবে। পূজাস্থলে পরস্পরকে যে কাজল পরান হয়, বোধহয় তা বশীকরণের জন্য। যাবতীয় শত্রু ও অশুভ শক্তিকে বশীকরণের জন্য এর ব্যবহার করা হয়। পরের দিন সূর্যোদয়ের পর ঐ বটেরডাল ও পূজার স্থানের অন্যান্য দ্রব্যাদি পুকুরে বা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। গ্রামের উপবাসী ব্রতী মেয়েরা ঐ সময়ে পুকুরে বা নদীর ঘাটে যান। সঙ্গে নিয়ে যান শেযাল শকুনি। অবশ্যই যাদের পূজা হয়েছে, তাদেরই নিয়ে যাওয়া হয়। আরও নেওয়া হয় চিঁড়ে, মুড়ি, দই, দুধ, গুড, শশা ইত্যাদি। ঐ বটডাল বিসর্জন হওয়ার পর ব্রতীরা শেয়াল শকুনি বিসর্জন দিয়ে ডুব দেন। ডুব দিয়ে উঠে প্রথমে শশায় কামড দেন। তারপর মেঘদর্শন করেন। তারপর করেন সূর্যদর্শন। সূর্যকে দর্শন করে প্রণাম করা হয়। ব্রতীরা বলেন, হে মেঘ, তুমি জীমূতবাহনের বাহন, তোমাকে নমস্কার করি। হে সূর্য তোমার মত আমি যেন পবিত্র ও দীপ্তিমান হই। শেযাল শকুনি বট গাছের ডাল ইত্যাদি নিবেদনের সময় ছেলেমেয়েরা ছডা কাটে—

শেয়াল গেল খালকে
শুকনি গেল ডালকে।

বিশ্বাস, আগের রাতে উপবাস দিয়ে শকুন ঠিকমত ব্রত উদ্‌যাপন করেছিল, কষ্ট স্বীকার করেছিল, কিন্তু শেয়াল মাঠ থেকে কাঁকডি খেযেছিল। তাই ছডায় তাকে পাঠান হয় খালে।

মালঞ্চ দেবী

উত্তর বাঁকুড়ায় রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রায় দু'মাইল উত্তরে 'নূতন-গ্রাম' নামক গ্রাম। এই গ্রামের উত্তর প্রান্তে রাস্তার ধারে একটি বড বাঁধ আছে। এই বাঁধটির পাড়ে অনুষ্ঠিত হয় মালঞ্চ দেবীর পূজা। স্থানীয় জন-সাধারণের বক্তব্য অনুযায়ী পূজাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

দেবীর বর্তমানে কোন মূর্তি নেই। অবশ্য বলা হয় যে বহু পূর্বে নাকি তাঁর প্রস্তরনির্মিত মূর্তি ছিল। বর্তমানে একটি মহুয়া গাছের তলায় অবস্থিত একটি বেদীর ওপরে রাখা কিছু নতুন ও পুরাতন মৃন্ময় হাতী ঘোড়াদের পূজা

করা হয়। মকর সংক্রান্তির পরের দিনকে এখানে বলে 'এখ্যান দিন'। এই দিনে মালঞ্চ দেবীর বিশেষ পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার উপকরণ বলতে বনফুল দিয়ে প্রস্তুত মালা, চাঁদমালা ও বনফুল। পুরোহিতের ধারণানুযায়ী দেবী চণ্ডিকার কোন রূপ মালঞ্চ দেবী নামে পূজিতা হচ্ছেন। বহুকাল আগে থেকেই দেবীর পূজায় মেষ বলি চলে আসছে। বর্তমানে মেষ বলির সঙ্গে ছাগ বলিও হতে দেখা যায়। দেবীর পূজায় প্রসাদ হিসাবে প্রদত্ত হয় দুধ, চিঁড়ে, গুড় ইত্যাদি। তাছাড়া দেওযা হয় মন্নই। মন্নই হ'ল পায়স জাতীয় প্রসাদ।

মালঞ্চ দেবীর পূজায় যে সব বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার করা হয় তা হল ঘণ্টা এবং ঢাক। পূজাটির আয়োজক গোয়ালা শ্রেণীর লোকেরা। এদের পদবী ঘোষ। পূজায় অংশগ্রহণ করে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই। ব্রতীরা পূজার শেষ সময় পর্যন্ত উপবাসী থাকেন। অবশ্য গ্রামের অন্যান্য মানুষেরাও যে পূজানুষ্ঠানে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন, তা নয়। পূজানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ কারীরা শক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই পূজাটি করে থাকেন। ব্রতীরা গ্রামের আদি বাসিন্দা। বর্তমানে দেবীর পূজারী হলেন বেলেসোলা গ্রামের বাসিন্দা কমল চট্টোপাধ্যায় এবং ওইরাম চট্টোপাধ্যায়।

কালামহাদন

কালামহাদন হলেন ফুলকুসমা গ্রামের গ্রামদেবতা। ফুলকুসমা গ্রামটি দক্ষিণ বাঁকুড়ার মধ্যস্থিত। এই গ্রামের হাইস্কুলের পাশে কয়েকটি প্রাচীন তেঁতুল গাছের নীচে দেবতার থান। দেবতার মূর্তি বলতে নিকষ কালো 'L' আকৃতির একটি প্রস্তর খণ্ড। প্রস্তর খণ্ডটির মাথায় বাঁশের ছাতা। দু'পাশে ছোট বড় আকৃতির অসংখ্য হাতী ও ঘোড়া। একেবারে হাতী-ঘোড়ার ছোট খাট পাহাড় বললেও অত্যুক্তি হয় না। দেবতার নিত্য পূজা হয়। তবে দিনে মাত্র একবার। ১লা মাঘ তারিখে দেবতার বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বসে মেলা। ভৈরবের অনুসরণে এই দেবতার পূজানুষ্ঠান হয়ে থাকে। তবে বলিদান ও আগুন সন্ন্যাসের মন্ত্র আলাদা। মেলা নাচ-গান ও উৎসবে পূজার স্থানটি মুখরিত হয়ে ওঠে। সংক্রান্তির রাত্রে হয় দেবতার জাগরণ। গ্রামের লোকজন এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে আগত সাঁওতাল, ভূমিজ, মাঝি

প্রভৃতিরা থানে খোলকরতাল মন্দিরা ইত্যাদি নিয়ে নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে রাত্রি যাপন করে। আত্মীয় কুটুম্ব ও অতিথিদের উপস্থিতিতে গ্রামটি ভরে ওঠে। উৎসবে প্রায় ১৫।২০ হাজারের মত লোক হয়। মেলায় আদিবাসীরা মুরগী লড়াই করায়। তাছাড়া কাঠিনাচ, পাতা নাচ, ডুয়াং নাচ ইত্যাদি ত আছেই।

পূজায় ছাগ বলি দেওয়া হয়। এও এক দেখাব জিনিস। অসংখ্য ছাগল বলি দেওয়া হয়। মানত কারীরা নিজ নিজ ছাগল নিজ নিজ হাতে ধরে রাখে, আর ঘাতক একে একে এইসব ছাগল বলি দেয়। বলির পরই শুরু হয় আগুন সন্ন্যাস। বিভিন্ন কামনা বাসনা এবং অসাধ্য সাধনের জন্যই লোকে আগুন সন্ন্যাসেব মানত করে। অনেকটা চড়কের মতন। দেবতার সামনে ২০।৩০ হাত দূরে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত কমপক্ষে ২ফিট লম্বা ১ফুট গভীরতা যুক্ত মাটির নালা কাটা হয়। একে বলা হয় 'জুলি'। এতে জ্বালা হয় কাঠকয়লার আগুন। মানতকারীরা ভিজে কাপড়ে এই আগুনের ওপরে পা ফেলে ফেলে চলে যায় অন্য প্রান্তে। যাত্রা শুরু হয় জুলির দক্ষিণ প্রান্ত থেকে। মানতকারীরা এই সময় এমন ভাবে দাঁড়ায় যাতে তাদের মুখ থাকে দেবতার দিকে। অন্য প্রান্তে পৌছবাব পর সেখানে কলাপাতার ওপর রাখা শ্যাওলায় পা দিয়ে দাঁড়ান মাত্র মানতকারীর আত্মীয়রা পায়ে কাঁচা দুধ ঢেলে দেয়। মানতকারীর পায়ে আগুন সন্ন্যাসের ফলে ফোস্কা পড়ে না।

সংকট তারিণী

প্রচলিত লোককাহিনী থেকে জানা যায় মল্লরাজাদের অধীন প্রজারা মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা পেতে ভূতেশ্বর গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং চরম সঙ্কট থেকে উদ্ধার লাভের আশায় এক দেবী মূর্তির আরাধনা করে। এই দেবীই সঙ্কটতারিণী নামে প্রসিদ্ধা। সংকট থেকে ত্রাণ করেন তাই দেবী এই নামে পরিচিতা। দেবীর অবস্থান পাঁচটি সিঁদুর পূর্ণ পেতল ও পাথরের কৌটার মধ্যে। লোকবিশ্বাস যে কৌটার মধ্যেই দেবীর মূর্তি বর্তমান। কৌটাগুলি ওজনে অনেক ভারী। এগুলি ভূতশহর গ্রামের রামদাস সিংহের বাড়ীতে সংরক্ষিত আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি এগুলির অধিকারী হয়েছেন। সংকটতারিণী পূজার্চনার সূত্রপাত মহারাজ গোপাল সিংহের আমল থেকে।

সরস্বতী পূজার পর যে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথি, সেই তিথির আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা উপলক্ষে উৎসব হয়। পূজার উপকরণের মধ্যে থাকে ছানা মিঠাইয়ের পাহাড়-পর্বত। বাঁকুড়ার উচ্চাবচ ভূপ্রকৃতির প্রতীক যেন এই মিঠাইয়ের পাহাড়। কেবলমাত্র মহিলারাই এই পূজার অধিকারিণী। পূজা শেষে ব্রতিনীরা আকাশের চাঁদ দেখে তবে জল গ্রহণ করে। হিন্দুদের পূজার্চনায় চাঁদের গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা অত্যন্ত বিরল ব্যাপার। এক্ষেত্রে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব সঙ্গত কারণেই অনুমিত হয়।

দেবীর কোন মন্দির নেই। উন্মুক্ত মাঠে একটি বেদী আছে। নির্দিষ্ট তিথিতে দেবীকে রামদাস সিংহের বাড়ী থেকে বাদ্য সহকারে এনে এই বেদীতে স্থাপন করা হয়। পূজার দিন পাঁচ-ছজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত দেবীর পূজা করেন। যাবতীয় দুর্যোগ এবং সংকটের হাত থেকে রক্ষা লাভের জন্যই দেবীর পূজা করা হয়ে থাকে। পূজা দিতে সকলে নগ্নপদে আসেন। এমনকি দেবীর পূজা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মেলাতেও নগ্নপদে যাওয়ার রীতি। ঘাটোয়াল Pilgrim রাস্তার ওপর গন্ধেশ্বরীনদীর ওপর অনুষ্ঠিত হয় এই লোক-উৎসবটি। দুর্গার ধ্যান মন্ত্রে দেবীর পূজা হয়। সন্ধ্যাবেলা অনুষ্ঠিত হয় দেবীর অভিষেক। দেবীর পূজা ও মেলায় সব সম্প্রদায়েব মানুষই যোগদান করে।

কেশবাসিনী

বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানার অন্তর্গত কোচকুড়া গ্রামে এক লৌকিক দেবী আছেন। ইনি হলেন কেশবাসিনী। গ্রামটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। যে মৌজায় গ্রামটি তা হল চক্‌কেশিয়া, নং ৩০। গ্রামটির আয়তন হবে এক বর্গমাইল। গ্রামটির বাসিন্দাদের মধ্যে আছেন ব্রাহ্মণ, তিলি, কর্মকার, নন্দী, বাগ্দী, গরাই, সূত্রধর, গোয়ালা, কুম্ভকার, বাউরী প্রভৃতি।

কেশবাসিনীর পূজা হয় চৈত্রমাসের কুড়ি তারিখের পর যে শনি এবং মঙ্গল-বার পড়ে সেই দিন গুলিতে। দেবীর প্রতিষ্ঠাতা শীতলা গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার। পূজার দিনে দেবীর যে পর্যন্ত না পূজা সমাপ্ত হয়, সে পর্যন্ত প্রতিটি পরিবারেই একজন করে উপবাসী থাকেন। বর্তমানে দেবীর পূজারী হলেন ঈশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশধরেরা।

দেবীর ভোগের মধ্যে আছে অন্নভোগ ; তাছাড়া পায়েস, লুচি এবং চিঁড়ের ভোগও দেওয়া হয়। দেবীর পূজায় যাথাল হয়। তবে পাঁঠা বলি দেওয়ার রীতি

নেই। অবশ্য গ্রামে মনসা পূজা উপলক্ষ্যে যে ছাগল বলি দেওয়া হয়, তা এই দেবীর থানেই হয়।

কুসুম গাছের তলদেশে গ্রামের শেষ পশ্চিম প্রান্তে দেবীর অবস্থান। কেশ-বাসিনী আসলে দুর্গার লৌকিক রূপ। দেবীর পূজায় যাগ যজ্ঞ হোম এমনকি চণ্ডীপাঠও হয়। পূজায় ঢাক বাজে। দেবীর বীজমন্ত্র ওঁ হ্রীং। গ্রামের ব্রাহ্মণ পুরোহিতে পূজা করেন। পূজায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল নরনারীই যোগদান করে। দেবীর থানে বেশ কয়েকটি আস্ত ও ভগ্নাদশাপ্রাপ্ত মাটির তৈরী হাতী ঘোড়া দেখতে পাওয়া যায়। দেবীর যাথালে অন্নভোগ হয়।

পূর্বে দেবীর পূজার জন্য জমি বন্দোবস্ত ছিল। বর্তমানে গ্রামবাসীদের সমবেত প্রয়াসে পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের কর্তা-ব্যক্তিরা পুরোহিতের সঙ্গে পরামর্শ করে পূজার দিন স্থির করেন এবং তারপর ঢুলী ঢোল বাজিয়ে দিনটির কথা গ্রামবাসীদের জানিয়ে দেয়। নির্দিষ্ট দিনে গ্রামবাসীরা যে যার সাধ্যমত পূজার উপকরণ দেবীর থানে পৌঁছিয়ে দেয়। চৈত্রমাস ছাড়াও বৎসরের যে কোনও শনি অথবা মঙ্গলবারে দেবীর পূজার আয়োজন হতে দেখা যায়। সাধারণত এই সময়ে মানসিক করা পূজা হতে দেখা যায়।

গ্রামের মানুষ বিপদগ্রস্ত হলেই দেবীর শরণাপন্ন হয়। কিংবদন্তী হ'ল দেবীর থানে যে মৃত কিংবা প্রাচীন বৃক্ষাদি আছে তা কেউ কাটতে পারেনা। কেউ কেউ নাকি চেষ্টা করে মারাত্মক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

ত্রিক্ষুরা দেবী (ত্র্যক্ষরা দেবী)

বিগত প্রায় দেড়শত বৎসর বাঁকুড়ার বড়জোড়া থানার অন্তর্গত মুক্তাতোড় নামক গ্রামে অর্চিত হয়ে আসছেন এক লৌকিক দেবী, যিনি ত্রিক্ষুরা বা ত্র্যক্ষরা দেবী নামে পরিচিত। গ্রামের পূর্বপ্রান্তে একটি প্রাচীন বাঁধের পাড়ের ওপর এই দেবীর থানটি অবস্থিত। থানটি রয়েছে একটি তেঁতুল গাছের তলায়। থানের কাছে শোভা পাচ্ছে বেশ কিছু ভগ্নদশাপ্রাপ্ত ও সম্পূর্ণ হাতী ও ঘোড়া। রয়েছে গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছাড়া বাউরী, কামার্যা, লোহার প্রভৃতিরা।

গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা জ্যৈষ্ঠ থেকে ৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া এই সময়ে পদাবলী কীর্তনেরও আসর বসে। ৫ই জ্যৈষ্ঠের পর যে কোনও শনি অথবা মঙ্গলবারে দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্যই সাড়ম্বরে।

এই দেবীর বীজমন্ত্র হল ওঁ হ্রীং। পূজারী দুর্গার ধ্যান করেন দেবীর পূজায়। নৈবেদ্য বলতে আতপ চাল, চিঁড়ে, গুড়, ফলমূল, দুধ ইত্যাদি। পূজার সময়ে গ্রামের ছোট বড় নির্বিশেষে এমনকি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই যোগ দেয়। পূজায় ঢাক বাজে। মহানবমীতে (শারদীয়া) গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার পৃথক ভাবে দেবীর পূজার আয়োজন করেন। পূজায় বলি দেওয়া হয় কুমড়ো এবং আখ। বিজয়া দশমীর দিন গ্রামের সমস্ত সধবারা দেবীর থানে উপস্থিত হয়ে সিঁদুর খেলেন। দেবীর নিত্যপূজা হয় না। গ্রামের কোনও বাড়ীতে যে কোন পূজা হোক, সেই উপলক্ষ্যে দেবীর থানেও পূজা দেওয়ার রীতি।

ত্রিক্ষুরা সম্ভবত দুর্গার লৌকিক রূপ। দেবীর প্রকৃত নাম সম্ভবত ত্র্যক্ষরা অর্থাৎ বেদজননী পরমাবিদ্যা। প্রসঙ্গত গায়ত্রী আবাহনের মন্ত্রটির উল্লেখ করা গেল—

আয়াহি বরদে দেবি, ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি, নমোহস্তুতে॥

হুগলী

দ্বারিকাচণ্ডী

হুগলী জেলার অন্তর্গত চন্দননগর সাবডিভিশনের দ্বারহাট্টা নামীয় গ্রামে অবস্থিত দ্বারিকাচণ্ডী। হাওড়া থেকে তারকেশ্বর লাইনে হরিপাল স্টেশনে নেমে বাসে করে কুটীর মোড় স্টপেজে নেমে পশ্চিম দিকে মিনিট পনের হাঁটা পথে দেবীর মন্দিরে পৌছান যায়।

দ্বারিকাচণ্ডী দ্বিভুজা দুর্গামূর্তি, মতান্তরে চতুর্ভুজা। তবে বর্তমানে কোন দেবী মূর্তি নেই। কেবলমাত্র ঘট আছে। ঘটের ওপর রয়েছে ডাব। পূর্বে নাকি ঘটের ওপর স্থাপন করা ডাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গাছ জন্মে যেত। বর্তমানে নাকি আর তা দেখা যায় না।

প্রায় তিনশত বছর আগে দ্বারিকাচণ্ডী প্রতিষ্ঠিত হন বলে বিশ্বাস। তখন ফতে সিং নামে দ্বারহাট্টায় একজন জমিদার ছিলেন। তিনি একদিন স্বপ্ন দেখলেন বর্তমান মন্দিরের দক্ষিণদিকস্থ পুকুরে একটি কাঠামো বর্তমান রয়েছে।

তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হলেন ঐ কাঠামোয় কুশ, গঙ্গামাটি ও গঙ্গাজল দিয়ে দুর্গা মূর্তি নির্মাণের জন্য। এইভাবে দেবী প্রতিষ্ঠিত হন। পরবর্তীকালে এক পাগল পুরোহিত দেবীর অঙ্গহানি করায় দেবীকে বিসর্জন দেওয়া হয়। কিন্তু এরপর অন্য কারিগর যখনই নতুন করে দেবী মূর্তি নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন, তখনই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই দেবীর মূর্তি নির্মাণে কেউই আর উৎসাহী নন।

বর্তমান মন্দির নির্মাণের পেছনেও একটা ছোট ইতিহাস আছে। দেবী-দ্বারিকা চণ্ডীর জন্য মূল যে বিশাল মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল, দেবী প্রতিষ্ঠার ঠিক আগে এক শৃগাল সেই মন্দিরে দেবীর জন্য নিমত বেদীর ওপর প্রস্রাব করে অপবিত্র করে দেয়। এর ফলে ঐ মন্দিরটি পরিত্যক্ত হয় এবং পরে এখনকার মন্দিরটি নির্মিত হয়। মন্দিরের গায়ে 'শুভমস্তু ১৬৮৬' এই তারিখটি উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরের গায়ে রয়েছে ইটের অপূর্ব কারুকার্য। রাধাকৃষ্ণের অসংখ্য চিত্রে মন্দিরটি এক সময়ে সুশোভিত ছিল। বর্তমানে মন্দিরের সম্মুখ ভাগ ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। মন্দিরের পেছনে রয়েছে পঞ্চমুণ্ডির আসন এবং তার পাশেই দেবীর জন্য নির্মিত পুষ্করিণী।

দ্বারিকা চণ্ডীর আশিসে সাপে কাটা রুগী আশ্চর্যজনক ভাবে বেঁচে যায় বলে বিশ্বাস প্রচলিত।

শারদীয়া দুর্গা পূজার চারদিন দেবীর বিশেষ পূজা হয়ে থাকে। দ্বারিকা-চণ্ডীর কাছে বলিদানের পর চারদিকের দশ বারোটি গ্রামের পূজায় বলিদান হবার রীতি বহু প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। মন্দিরের পুরোহিতের জন্য যে প্রায় ২২ বিঘা জমি আছে, তার আয় থেকেই দেবীর নিত্য পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সাধারণ আতপ চালের নৈবেদ্য আর সেই সঙ্গে দেওয়া হয় ফল ও মিষ্টান্ন। সন্ধ্যাবেলা দেবীর আরতি হয়। ভোগে দেওয়া হয় রসকরা। দেবীর বিশেষ পূজার ব্যয় বহন করে থাকেন তৎকালীন জমিদার সিংহ রায়েরা।

চণ্ডালকন্যা বিশালাক্ষী

হুগলী জেলার হরিপাল থানার অন্তর্গত কেষ্টপুর (কৃষ্ণপুর) গ্রামে অধিষ্ঠিতা আছেন এক লৌকিক দেবী যাঁর নাম চণ্ডালকন্যা বিশালাক্ষী। নামেই সহজে বোঝা যায় দেবীর মাতৃমূর্তি। কালীর মত চতুর্ভুজা। কিন্তু ব্যতিক্রম হ'ল

দেবী লোলজিহ্বা নন। জিভটি মুখের ভেতর ঢোকান। গায়ের রঙ বাসন্তী। দেবীর মন্দিরের বর্তমানে জীর্ণ অবস্থা। বলা হয় যে মন্দিরটি নাকি সুপ্রাচীন এবং আনুমানিক হাজার বছরের পুরাতন। মন্দিরটি ভূমিতল থেকে প্রায় ২০ ফিট উঁচুতে। মন্দিরের সামনে অবস্থিত বিরাট চাতাল এবং মন্দিরের পেছনে রয়েছে বিশাল প্রাচীন এক বটগাছ।

দেবীর পূজায় প্রদত্ত হয় আতপ চালের নৈবেদ্য। সঙ্গে থাকে ফল ও সন্দেশ। সন্ধ্যাবেলায় শুধুমাত্র বাতাসা বা সন্দেশ দেওয়ার রীতি।

বর্তমানে বৎসরে মোট পাচবার দেবীর বিশেষ পূজার আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই বিশেষ দিন বা উপলক্ষ্যগুলি হ'ল যথাক্রমে বৈশাখী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, দুর্গা নবমী, বিজয়া দশমী ও কালীপূজা। এই ক'দিন দেবীর জন্য বিশেষ ভোগের আয়োজন হয় এবং এই সময়ে দেবীর পূজা উপলক্ষ্যে ছোটখাট মেলাও বসে। তবে দুর্গা নবমীর মেলাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দিন বহু সংখ্যক বলি হয়। বিশেষ পূজার দিনগুলিতে দেবীর পূজার আয়োজন করেন যদিও গ্রামবাসীরা কিন্তু নিত্যকার পূজার দায়িত্ব পুরোহিতের। পূজার জন্য রাজা হরিপাল বেশ কিছু জমি জায়গা দিয়েছিলেন, কিন্তু এখন তার কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বর্তমানে মন্দিরের পুরোহিতের নাম লক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী। আসল পদবী চট্টোপাধ্যায়। তৈলঙ্গ স্বামী নাকি কোন এক সময় এখানে এসেছিলেন এবং সেই সময়ে যিনি মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন, তাঁকে দীক্ষিত করেন আর সেই থেকে 'গোস্বামী' বলে পরিচিত হন। এখানকার মন্দিরের পুরোহিত 'চণ্ডালী বামুন' নামেই সমধিক পরিচিত। অন্য এক মতে মন্দিরের পুরোহিত স্বপ্নে 'গোঁসাই ঠাকুর' নামে পরিচিত হবার নির্দেশ লাভ করেছিলেন।

এইবার এই দেবীর কাছে পূজা দেবার উদ্দেশ্যের কথা বলা যেতে পারে। একশিরা, বিছানায় প্রস্রাব করা, তড়কা এবং মেয়েদের অনিয়মিত ঋতুস্রাব এখানকার মন্ত্রলব্ধ মাদুলিতে নাকি সারে।

পূর্বে নাকি মন্দিরের পাশ দিয়ে এক নদী প্রবাহিত ছিল। সেই নদীর নাম কৌশিকী। এই নদী দিয়েই বহুকাল আগে দেবী ভেসে আসেন এবং বর্তমান পুরোহিতের পূর্বতন পুরুষকে স্বপ্নাদেশ দেন বর্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠা করার। মন্দির যেখানে অবস্থিত, আগে সেখানে ছিল শ্মশান। প্রথমে দেবীর নাম ছিল বিশালাক্ষী মাতা। পরে কিভাবে ইনি 'চণ্ডাল কন্যা বিশালাক্ষী'তে

রূপান্তরিত হন সে সম্পর্কে এক বড় অদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

শ্মশানের এক চণ্ডাল তার ছেলের বিবাহ দিয়ে তারপর দেবীকে প্রণাম করাবার জন্য পুত্র এবং পুত্রবধূকে নিয়ে দেবীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। চণ্ডাল এবং তার পুত্র ছিল তখন মন্দিরের বাইরে। পুত্রবধূ লালচেলী পরিহিতা অবস্থায় ঠাকুর ঘরের আড়াআড়ি ভাবে থাকা দরজা ধরে তন্ময়ভাবে দেবী মূর্তি দর্শনরতা ছিল। পুত্রবধূর লালচেলীতে আকৃষ্ট হয়ে দেবী তাকে খেয়ে ফেলেন। চণ্ডাল এতে অত্যন্ত রুষ্ট হয় এবং দেবীকে 'চণ্ডাল কন্যা' নামে অভিহিত করে। সেই থেকেই দেবীর এই নামে পরিচিতি।

ভগবতী তলার মেলা

ছোট একটি গ্রাম। গ্রামটির নাম জড়ুর। এ'টি পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত। চক্রপুর কালীবাড়ী থেকে মাত্র আধ কিলোমিটারের ব্যবধানে জড়ুর গ্রামটির অবস্থান। এই গ্রামেই এক সময়ে ছিল প্রসিদ্ধ ভগবতী দেবীর মন্দির। অনুমান মন্দিরটি তিন শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

বলা হয় জড়ুর গ্রামে সে সময়ে ছিল তাঁতীদের বসতি। দিবারাত্র তাঁত চলার শব্দে এখানকার আকাশ-বাতাস হয়ে উঠত মুখরিত। একদিন ভগবতী-দেবী তাই তাঁর ভক্ত পুরোহিতকে স্বপ্নাদেশে জানালেন তিনি তাঁত চলার অবিরাম শব্দে বড় বেশি অতৃপ্ত। তাই তিনি কোন নির্জনস্থানে চলে যেতে চান।

দেবীর ইচ্ছানুযায়ী তাঁকে অতঃপর এক নির্জনস্থানে স্থাপন করা হয়। কালক্রমে সেই স্থানটি পরিচিত হয় ভগবতীতলা নামে। চক্রপুর কালীবাড়ী থেকে এক-দেড় কিলোমিটার পশ্চিমে চালতাপুর গ্রামের কাছে প্রতিষ্ঠিত হয় দেবী মন্দির। চক্রপুর থেকে মাটির রাস্তা মন্দির পর্যন্ত গেছে।

আগে জড়ুরের মন্দির সংলগ্ন স্থানীয় পুকুরে বিশ্বাসী মানুষ জন দেবীর নামে মানত করে রুপোর থালা অর্ঘ্য স্বরূপ প্রদান করতেন। এই প্রসঙ্গে যে রীতিটি অনুসৃত হ'ত তা হ'ল রুপোর থালায় পুষ্পার্ঘ সাজিয়ে পুকুরের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হ'ত। থালাটি ঠিক মাঝ পুকুরে নিমজ্জিত হয়ে যেত। ভক্তদের বিশ্বাস, দেবী এইভাবেই পূজা গ্রহণ করতেন। আর এর মাধ্যমে দেবী কর্তৃক

ভক্তের মনস্কামনাও চরিতার্থতা লাভ করত।

বলাবাহুল্য পূর্বের স্থান থেকে দেবীকে স্থানান্তরিত করার পর এই প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়। দেবীকে নিয়ে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত। একটি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কিংবদন্তীটি হ'ল একবার এক বণিক তাঁর বজরা নিয়ে নিকটস্থ নদীপথে যাচ্ছিলেন। জ্যোৎস্না রাত্রে মন্দির সংলগ্ন চত্বরে এক পরম রূপবতী রমণীকে এলোচুলে বিচরণ করতে দেখে বণিক কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তিনি বজরার গতি বন্ধ করতে নির্দেশ দেন। এরপর অসৎ উদ্দেশ্যে ঐ রমণীকে বজরায় আহ্বান করেন। কিন্তু রূপসী বজরায় পদার্পণ করা মাত্র বজরাটি নাকি নদীতে ডুবে যায়। কোন ক্রমে দু'একজন মাঝি মাল্লা রক্ষা পায়। বিশ্বাস, আসলে এই রূপবতী ছিলেন স্বয়ং ভগবতী। তিনি বণিককে ঐভাবে শাস্তিদান করে তার মন্দ অভিলাষের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। অবশ্য বর্তমানে মন্দির সংলগ্ন স্থান দিয়ে আর নদী প্রবাহিত হয় না। তবে আগে হ'ত বলে লোকের বিশ্বাস।

প্রতি বছর ১লা বৈশাখে ভগবতীতলায় মেলা বসে। এ'দিন দেবীর উদ্দেশে পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। বহু কুমারী মেয়েকে এইদিন দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হতে দেখা যায়। তাছাড়াও অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে যাদের, তারাও দেবীর কাছে পূজা দিতে আসেন। দীর্ঘদিনের মানত করা চুল, নখ, দাড়ি এসব দেবীর উদ্দেশে ফেলে থাকেন। আর মন্দির সংলগ্ন মজা পুকুরে স্নান করেন।

বুড়ো দেওয়ান

হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল থানার অন্তর্গত চক চণ্ডীনগর গ্রামে বুড়ো দেওয়ান ফকিরের মাজার অবস্থিত। এই মাজারে বছরে মাত্র দু'বার নামাজ পড়া হয় এবং ধর্মালোচনা করা হয়। এই সময়ে গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করা হয় অন্ন বস্ত্র। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে চকচণ্ডীনগর এক অত্যন্ত গণ্ডগ্রাম। মাজারের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে যে নদীটি, তার নাম কানা দামোদর।

চকচণ্ডীনগর গ্রামটি খুবই অনুন্নত এবং মুসলমান অধ্যুষিত। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে বাবা বড় দেওয়ান এই স্থানে বাস করতেন। তাঁর দেহ রাখার পর ঐ স্থানে তৈরী হয় বর্তমান মাজারটি। মাজারটি প্রায় ১৫ ফিট দীর্ঘ এবং

প্রস্থেও এ'টি ১৫ ফিট। মাজারের পাশেই রয়েছে একটি ক্ষুদ্র গৃহ। বর্তমানে তার ভগ্নাবস্থা। এখানেই থাকতেন বাবা বুড়ো দেওয়ান। স্থানটি বেশ রমণীয়। বিভিন্ন ধরণের গাছপালা স্থানটিকে ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে।

মানুষ জন এখানে বিশেষ যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসে তা নয়। তবে যার যা কিছু বক্তব্য সব এখানে এসে মালিককে জানিয়ে যায়।

মাজারটি দেখাশোনা করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণকে নিয়ে প্রস্তুত একটি কমিটি আছে। এই কমিটির অধীনে বেশ কিছু সম্পত্তি আছে। তার আয় থেকেই স্থানীয় মসজিদের ব্যয় নির্বাহ হয়, তাছাড়া একটি মাদ্রাসাও পরিচালিত হয়ে থাকে। সর্বোপরি উৎসবের দিনে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে অন্ন বস্ত্র বিতরণ ত আছেই। বুড়ো দেওয়ান মাজারের পরিচালনা করেন এক প্রবীণ মুসলমান। এঁর নাম শেখ আবদুল রউফ।

স্থানীয় জনগণের বিশ্বাস এই বুড়ো দেওয়ানের কাছে নিজের পাপ স্বীকার করলে দিন দুনিয়ার মালিকের কাছে সহজে পৌছে যাওয়া যায়। এই কারণে স্থানীয় জনগণ মাজারটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। তবু আর্থিক অনটনে মাজারটির বড়ই দুরবস্থা।

হাওড়া থেকে হরিপাল স্টেশনে নেমে এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণ দিকে রিক্সায় বা হেঁটে গেলে এই মাজারে পৌছান যায়।

বোড়াই চণ্ডী

হুগলী জেলার অন্তর্গত, চন্দননগর মহকুমায় সিঙ্গুর থানার অধীন বোড়াই গ্রামে অবস্থিত বোড়াই চণ্ডী। বলা হয় দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শ্রীমন্ত সওদাগর। সে সময়ে এই গ্রামে যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল সরস্বতী নদী। বলা হয় এই নদী দিয়ে যাবার সময়ে শ্রীমন্ত সওদাগর বোড়াই গ্রামে বোড়াই চণ্ডীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেবীর পূজা করে তারপর বাণিজ্য করতে যান। শ্রীমন্ত সওদাগর চণ্ডীতলা, চন্দননগর ও মাকড়দহেও ঠিক একই রকম দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন।

পূর্বে অবশ্য দেবীর মন্দির নির্মিত হয়েছিল খড়ের চাল ও মাটির দেওয়াল দিয়ে। বর্তমানে অবশ্য দেবীর পাকা মন্দির।

বোড়াই চণ্ডী বলতে একটি বড প্রস্তর খণ্ড মাত্র বিদ্যমান। এরই পাশে শ্বেত প্রস্তর নির্মিত একটি জগদ্ধাত্রী মূর্তি। পূর্বে এই মূর্তিটি ছিল পিতলের।

দেবীর পূজা করেন স্থানীয় ব্রাহ্মণ। দেবীর পূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেককেই জমি দেওয়া ছিল। বর্তমানে শুধু ঢাকী এবং ব্রাহ্মণই কেবল তাঁদের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। গ্রামবাসীরা বর্তমানে একটি কমিটি গঠন করেছেন। সেই কমিটি সরকারী খাল ও জমি নিজে নিয়ে মাছ ও ফসল চাষ করেন এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণের আর্থিক সাহায্য নিয়ে পূজার ব্যয় নির্বাহ করে থাকেন।

বোড়াই চণ্ডীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বৎসর ৩১শে বৈশাখ। তাছাড়া বিজয়া দশমী ও জগদ্ধাত্রী পূজার সময়েও ধূমধাম সহকারে পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

দেবীর পূজায় লাগে ফল। সাধারণ নৈবেদ্য দিয়েই দেবীর পূজার্চনা হয়। দু'বেলাই পূজা হয়। দেবীর পূজার সময় ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি পান না। অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষ দেবীর পূজা নিজেরা করতে পারেন না।

৩১শে বৈশাখ বোড়াই দেবীর প্রতিষ্ঠা দিবসে এখানে অনুষ্ঠিত হয় দেশমালার উৎসব। দেশমালার উৎসব বলতে বোঝায় যখন কোন একটি গ্রাম অথবা কতকগুলি গ্রাম একত্রে বৎসরের কোন এক নির্দিষ্ট দিনে একত্রে মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট কোন দেব বা দেবীর আরাধনা করেন এবং পরে ঐ দেবস্থানে বসে দেব দেবীর কাছে উৎসর্গীকৃত ভোগ নিজেরা গ্রহণ করেন। ৩১শে বৈশাখ বোড়াই ছাড়া আরও আশপাশের আটদশটি গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ একসঙ্গে নিকটবর্তী গঙ্গা থেকে জল বয়ে আনেন এবং সেই জল দেবীর মাথায় ঢেলে পূজা দেন। পূজার পরে সকলে মিলে ঐদিন দেবীর ভোগ রাঁধেন এবং খাওয়া দাওয়া সেরে যে যার বাড়ী ফিরে যান। এই উৎসবের জের চলে দিন তিন চার। পূজার পরের দিনগুলিতে হয় যাত্রা, গান, নাটক ইত্যাদি। এই উপলক্ষ্যে ছোটখাট একটি মেলাও বসে।

পতিতুর্গা মাতা

হুগলী জেলার পলাশী গ্রামে পতিতুর্গা মাতার মন্দিরটি অবস্থিত। আনুমানিক দেড়শত বৎসরের প্রাচীন এই মন্দির। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে গুড়াপ স্টেশনে নেমে রিক্সায় মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। অথবা কর্ড লাইনে হাজিগড় স্টেশনে নেমে প্রায় মাইল চারেক হেঁটে মন্দিরে যাওয়া যায়। গুড়াপ স্টেশন থেকে দশমড়া গামী বাসে পলাশীর মোড় স্টপেজে নেমে প্রায় দু'মাইল হাঁটা পথেও মন্দিরে পৌঁছান যায়।

বলা হয় এক অন্ত্যজ শ্রেণীর ভক্ত এই দেবীর ঘটস্থাপন করে এবং পরবর্তী-কালে খড়ের ঘর তৈরী করে দেয়। ভক্তটি জাতিতে হাড়ি, সেইই দেবীর পূজা করত। পাশেই বহমানা পতিতুর্গা নদীতে সে খেয়া পারাপার করত। স্বপ্নে নির্দেশ লাভ করেই সে ঘটস্থাপন করে। পরে স্বপ্নে দেখা দেবীর মত মূর্তি তৈরী করে প্রতিষ্ঠা করে। এখনও পর্যন্ত কোন ব্রাহ্মণ দেবীর পূজার্চনা করেন না। এখনও পর্যন্ত পূর্বোক্ত হাড়িটির বংশধরেরাই দেবীর পূজা চালিয়ে আসছে। বর্তমান মন্দিরটি স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্যে নির্মিত। দেবীর নামে কিছু জায়গা-জমি আছে। মূলতঃ এর থেকে লব্ধ আয়ে এবং তৎসহ জনসাধারণের দানে দেবীর পূজার্চনার ব্যয়ভার নির্বাহ হয়ে থাকে।

প্রতিদিন দু'বেলা দেবীর পূজা হয়। পূজার উপকরণ সাধারণ। কোন বৈচিত্র্য নেই। তবে শনি-মঙ্গলবারের পূজায় ভক্তসমাগম অধিক হয়।

দেবীর বিশেষ পূজা হতে দেখা যায় আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজায়। এ সময়ে অনেক বলিদানও হয়। বৈশাখ মাসে হয় অন্নকূট। এই সময়ে গ্রামের জন-সাধারণ এবং বহিরাগত ভক্তদের প্রদত্ত অর্থে দেবীর ভোগের আয়োজন হয়। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব ভক্ত এই ভোগ গ্রহণ করেন। তাছাড়া পৌষ সংক্রান্তিতেও দেবীর বিশেষ পূজার আয়োজন হয়। এই সময়ে মেলাও বসে।

অন্যান্য সব দেব-দেবীর মত এই দেবীর কাছেও বিশেষ এক উদ্দেশ্যেই পূজা দেওয়া হয়। উদ্দেশ্যটি হ'ল পুত্র সন্তান লাভ।

বর্তমান মন্দিরে যে মূর্তি আছে তা হ'ল শিব ও পার্বতীর। শিব ও পার্বতী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। সঙ্গে শিবের বাহন ষাঁড় এবং পার্বতীর বাহন সিংহও আছে। দেবীর দু'টি মাত্র হাত। বাঁ হাতে রয়েছে একটি শিবলিঙ্গ আর দক্ষিণ

হস্ত বরাভয় দানে রত। দেবীর বাম হস্তে শিবলিঙ্গ দেওয়ার অর্থ দেবী সমগ্র বিশ্বকে নিজের হাতের তালুতে ধরে রেখেছেন। অর্থাৎ শিবকে বিশ্বরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

বিশালাক্ষা দেবী

হুগলী জেলার হরিপাল থানার কেষ্টপুর গ্রামে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির। হাওড়া থেকে হরিপাল রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে, সেখান থেকে বাসে মোশাই-মোড স্টপেজ। মোশাইমোড থেকে উত্তর দিকে মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথে এই মন্দির। বিশালাক্ষী দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন চাঁদসওদাগর বলে কথিত আছে। চাঁদসওদাগরই নাকি দেবীর পূজার জন্য বেশ কিছু পরিমাণ জমি দিয়েছিলেন। এখনও সেই জমির আয় থেকেই দেবীর নিত্য পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে আগের মত জমির প্রাচুর্য আর নেই। অধিকাংশ জমিই বিক্রয় হয়ে গেছে।

দেবীর নিত্য পূজা হয় সকাল ও সন্ধ্যায়। সাধারণ নৈবেদ্য দিয়েই পূজার্চনা হয়। দেবীর বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপূজার ক'দিন। এই সময়ে বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তরা এখানে এসে উপস্থিত হন, পূজা দেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করেন। দেবীর পূজার দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তিনটি ব্রাহ্মণ পরিবারের ওপর। উত্তরাধিকারসূত্রেই এরা পূজার্চনার দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

দেবীর মূর্তিটি কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। দেবী দু'হাত বিশিষ্টা। তার মধ্যে বাম হস্তে বরাভয় দান করছেন, অপরপক্ষে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করে আছেন শঙ্খ। দেবী শিবমূর্তির ওপর দণ্ডায়মানা কিন্তু কালীর মত মূর্তিতে সলজ্জ ভাব নেই। দেবী লজ্জায় জিহ্বা বার করেন নি। গলায় মুণ্ডমালা শোভিত। যে বেদীর ওপর দেবী আসীন, তার চারপাশেও নরমুণ্ড শোভিত। দেবীর পদতলে এক ব্যাধ ভিক্ষাপ্রার্থী। কথিত হয় এই ব্যাধের মাধ্যমেই দেবী দুষ্টদের দমন করে-ছিলেন। ব্যাধ দুষ্ট মানুষদের হত্যা করে দেবীকে সন্তুষ্ট করেছিল। সজ্জিত নরমুণ্ডগুলি তারই চিহ্ন। মূর্তির গায়ের রঙ সাদা। মাটির কাপড় পরিহিতা। কথিত হয়ে থাকে দেবীর প্রাচীন মন্দিরটি বজ্রাঘাতে বিনষ্ট হয়েছে এবং এই বজ্রাঘাতের কারণ পুরোহিতের অনাচার। দেবীর মাথায় মুকুট কিন্তু তেমনভাবে অলঙ্কৃত নন।

স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁদের যে সব সন্তান বিশালাক্ষীর অনুগ্রহে জন্মগ্রহণ করেছে বলে বিশ্বাস করেন, তাদের অন্নপ্রাশনের আগে দেবীর কাছে নিয়ে এসে মস্তক মুণ্ডিত করে চুল দান করে যান। তাছাড়া এইসব দোর ধরা শিশুদের দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করান হয়।

মন্দিরটি গাছপালায় সমাচ্ছন্ন বেশ নির্জন স্থানে অবস্থিত। তবে মন্দির বলতে আমাদের যে প্রচলিত ধারণা এই মন্দির সেরকম কিছু নয। ছোট একটি পাকা ঘর। সামনে তার টিনের চাল।

পুরুলিয়া

ইঁদপূজা

বারো মাসে বারো পরব
ভাদর মাসে ইঁদ করো,
চল্ দেওরা বাইডাম্ যাব।
ইঁদ দেখতে যাব, শাখা পরা লোরে
ঘর ফিরিবার বেলা
মার খাইল রে।

সমগ্র পুরুলিয়া জেলার নানা স্থানেই ভাদ্রমাসের রাধাষ্টমীর পরের শ্রবণা-নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে যে পুজাটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, সেটি হ'ল ইন্দ্রপূজা। স্থানীয় নাম ইঁদ পূজা। পূজাটি একান্তভাবেই রাজা, জমিদার বা ভূস্বামীদের। স্বভাবতঃ তাই এই পূজার সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। পূজার ব্যয় বাহুল্যের জন্যই সম্ভবত পূজাটি রাজা জমিদার অথবা ভূস্বামীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তদুপরি দেবরাজ ইন্দ্রের আরাধনার অধিকার থেকে

সাধারণ প্রজা রাইয়ত প্রভৃতিদের বঞ্চিতও বরা হয়ে থাকতে পারে। তবে ভূস্বামীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হলেও সাধারণ মানুষও এই পূজানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে প্রভূত আনন্দ লাভ করে থাকেন।

রাধাষ্টমীর দিন দুটি শাল গাছ কাটা হয়—একটি বাড়ীর এবং অপরটি বাড়ীর বাইরে পূজার জন্য। বাড়ীর জন্য কাটা গাছটি লম্বায় সোয়া দু'হাতের কম হয় না। কিন্তু বাইরের জন্য যে গাছটি কাটা হয়—সেটি লম্বায় প্রায় ৪০।৫০ হাত হয়ে থাকে। এটিকে বাইরের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হয়। যারা শালগাছ কেটে আনে, তারা 'ঘিরা' বা 'শবর' নামে পরিচিত। গাছ কাটার আগে শবররা প্রথমে বনদেবীর পূজার্চনা করে। ইন্দ্র পূজার জন্য আবার যে কোন শালগাছ হলেই হয় না। পূজার জন্য এমন গাছের প্রয়োজন যার কোন ডালপালা থাকেনা। পূজার জন্য প্রয়োজন কেবল মূল গাছটির।

ইন্দ্র পূজার আগের পনের দিন, কমপক্ষে এক সপ্তাহ যাবৎ একবেলা নিরামিষ আহার করতে হয়। পূজার ঠিক আগের দিন রাত্রে হয় অধিবাস। এর নাম 'আধাগাছি' বা 'আধগাছি'। আধাগাছির দিন শালগাছ দু'টিকে শালকাঠেরই তৈরী নির্দিষ্ট একটি খুঁটির ওপর হেলিয়ে রাখা হয়। যে ফ্রেমটিতে ইন্দ্ কাঠটি ঢোকান থাকে, সেই ফ্রেমের বিপরীত দিকে আর একটি কাঠ লাগান থাকে। এই কাঠটির মাথায় থাকে তিনটি খাঁজ, এই খাঁজকাটা কাঠটি 'মাওসী খুঁটা' নামে পরিচিত।

দ্বাদশীর দিন ঘরের এবং বাইরের দু'টি গাছকে নতুন কাপড় পরান হয়। আধাগাছ এবং পূজা দুই-ই হয় প্রথমে বাড়ীতে। পূজার পর বাড়ীর গাছটিকে পাঁচজনে মিলে প্রদক্ষিণ করার রীতি। প্রদক্ষিণকারী পাঁচজনের মধ্যে থাকেন রাজা-রাণী, পুরোহিত এবং রাজবংশেরই অপর দু'জন ব্যক্তি। প্রদক্ষিণের পর তোলা হয় ইন্দ্। ঘোড়া অথবা পাল্কীতে চড়েই রাজা-রাণী গাছটিকে প্রদক্ষিণ করেন প্রথমে। পূজার পর রাজা-রাণী সহ উপস্থিত জনতা গাছটিকে টেনে সোজা করে দেয়। এই অবস্থায় দু'টি গাছই নয়দিন পর্যন্ত রাখা থাকে। নয়দিন পরে বিসর্জনের অনুষ্ঠান। বিসর্জনের সময় গাছ দু'টিকে স্থানীয় একটি পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়। বাইরে স্থাপিত গাছটির গায়ে জড়ান নতুন কাপড় ঘিরারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী এই কাপড়ের অংশ সঙ্গে থাকলে সকল প্রকার কাজে ঘটে অনায়াস সাফল্য।

পূজার পর যে কয়দিন ইন্দ্ গাছ দু'টি থাকে, সেই ক'দিন পূজানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির বাড়ীর কোন জিনিস বাইরে দেওয়া হয় না। এই ক'দিন ধানসিদ্ধ কিংবা লাঙ্গলজোড়া প্রভৃতি প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মাদি বন্ধ থাকে।

পূজা শেষে রাজা এবং রাণী সুসজ্জিত স্থানে আসন গ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম পুরোহিত তাঁদের আশীর্বাদ করেন। এরপর প্রজাবর্গ এবং বয়োজ্যেষ্ঠরা একে একে এসে রাজা-রাণীকে প্রণাম অথবা আশীর্বাদ করেন। সেই সংগে তাঁরা রাজা-রাণীকে নানাবিধ উপঢৌকন দিয়ে যান। পূর্বে যখন ভূস্বামী বা জমিদারদের আর্থিক স্বাচ্ছল্য ছিল, তখন ইন্দ্র পূজার দিন সকল প্রজাই তাঁদের বাড়ী নিমন্ত্রিত হতেন।

ইন্দ্রপূজা ধনসম্পদ রক্ষা এবং বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পূজার দিন বৃষ্টি হলে বলা হয় মাসী কাঁদছে। উল্লেখযোগ্য পুরুলিয়া জেলায়— ন্দ্রপূজা উপলক্ষে নৃত্য অথবা গীত হয় না।

কিন্তু মেদিনীপুর জেলার কোন কোন অংশে ইন্দ্রপূজা উপলক্ষ্যে পূজার অপরিহার্য অঙ্গরূপে নৃত্য-গীতাদির আয়োজন হতে দেখা যায়। এখানে ইন্দ্রপূজা উপলক্ষ্যে অবশ্য মাত্র একটি শালগাছ তুলে এনে গৃহের আঙ্গিনায় স্থাপন করা হয়। পুরুলিয়ায় যেমন একাদশীর দিন আধাগাছির রীতি, মেদিনীপুরে কিন্তু তোলা গাছটিকে আঙ্গিনায় রাখা হলে তাকেই 'আদাগাছ' বা আধাগাছ বলা হয়। এরপর গাছটিকে শালু কাপড় এবং ফুলের দ্বারা সজ্জিত করা হয়। এরপরই শুরু হয় গাছটিকে ঘিরে পল্লীবাসী মেয়ে ও শিশুদের গীত-সহকারে নৃত্য। নৃত্যানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য বৃষ্টিলাভ। স্থানীয় বিশ্বাস অনুযায়ী এরূপ নৃত্যগীতে আকৃষ্ট হয়ে ইন্দ্র নেমে আসেন পৃথিবীর বুকে। আর তারই ফলে শুরু হয় অবিরাম বর্ষণ। আরও উল্লেখযোগ্য, শালগাছটির ওপরে রক্ষিত কাঠটি যে দিকে হেলে পড়ে, প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী সেই দিকেই নাকি বিশেষ করে ইন্দ্রের করুণা বর্ষিত হয়। অর্থাৎ সেইখানেই বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য ঘটে।

ইঁদপূজার প্রচলন পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুর ছাড়াও পশ্চিমবাংলার রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত, অন্যান্য স্থানেও দেখা যায়। এসব স্থানের মধ্যে আছে বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম ইত্যাদি। ইঁদপূজা বা পরব একেক জায়গায় একেক নামে পরিচিত। কোথাও এ'টি পরিচিত ছাতা পরব নামে, কোথাও বা ইন্দি পরব আবার কোথাও ইন্দিভূতের পূজা। কোন কোন স্থানে

এমন অনুশাসন প্রচলিত আছে যে ইঁদ গাছ তোলার আগে যত রোদ বৃষ্টিই হোক না কেন, কেউ নিজের ছাতা খুলতে পারবে না। যদি কেউ খোলে তাহলে সবাই মিলে ঢিল পাটকেল ছুঁড়ে সেই ছাতা ভেঙ্গে ফেলে। ইঁদ পূজার দিন আদিবাসীরা তাঁদের ক্ষেতে ছোট ছোট শালগাছের ডাল পুঁতে দেন। শস্যক্ষেত্রে পুঁতে দেওয়া শাল শাখার নাম ইঁদ ডাং। বিশ্বাস, এর ফলে অপদেবতার কুনজর থেকে ক্ষেতের শস্য রক্ষা করা সম্ভব হয়।

পুরুলিয়ায় চাকলতোড়ে ছাতা পরবের মেলা বসে ইঁদ পূজাকে কেন্দ্র করেই। এই মেলার পত্তনের সঙ্গে দেশপ্রেমের ইতিহাস জড়িত রয়েছে। কিংবদন্তী, চাকলতোড়ের এই ছাতা টাঁড়েই পঞ্চকোট রাজের নেতৃত্বে একদিন হাজার হাজার সাঁওতাল বিদেশী ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন, অংশ নিয়েছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহে।

ইন্দ্রপূজার উল্লেখ সম্বলিত একটি ভাদু গানের উল্লেখ করা গেল পরিশেষে—

সারা ভাদর রাখিলাম মাকে কুঁচি কপাট দিয়া গো।
আর রাখিতে নারিলাম মাকে ছাতা হল বাদী গো।
ইঁদ আইল লিতে ভাদু কাপড় দিলে ধুতে গো।
ছাতা আইল লিতে ভাদু দরিয়ায় ঝাপ দিলে গো।

বাঁধনা পরব

পুরুলিয়া জেলার একটি জনপ্রিয় লোক-উৎসব হ'ল 'বাঁধনা পরব' বা 'বাঁদনা পরব'। এই পরবের মুখ্য চরিত্র হ'ল গরু বা মোষ। আসলে বাঁদনা শব্দটির অর্থ হ'ল বন্দনা করা। এই বন্দনা আর কারো নয় মূলতঃ গরুর। কার্তিকী অমাবস্যা হ'ল এই পরবের শ্রেষ্ঠ দিন। তবে পরবের আয়োজন চলে বহু আগে থেকেই। বলা চলে দুর্গা পূজার আগে থেকেই। আর এই পরবের অংশীদার ধনী-নির্ধন তরুণ-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলে। অবশ্য তুলনামূলকভাবে উৎসবের প্রস্তুতি পর্বে পুরুষের চেয়ে মেয়েদেরই অধিকতর ব্যস্ততা দেখা যায়।

প্রস্তুতি পর্বের মধ্যে আছে নিজের নিজের ঘরবাড়ী পরিষ্কার করা, বর্ষায় ক্ষয়প্রাপ্ত আঙ্গিনা, গোয়াল, মেঝে ইত্যাদির সংস্কার সাধন। তাছাড়া বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলকে আগাছা মুক্ত করার কাজও এই সময়ে চলে। দেওয়ালে

অঙ্কিত করা হয় রঙীন ফুল এবং লতাপাতা। বাড়ীর মেয়েরা এই সময়ে গুঁড়ি গোলা জলে হাত ডুবিয়ে সেই হাতের ছাপ মেরে দেয় বাড়ীর দেওয়ালে। এই হাত ছাপ হ'ল বাড়ীর দলিল।

বিজয়ার সন্ধ্যাবেলা থেকেই শুরু হয়ে যায় অহিরা গান। অহিরা গান হ'ল বাঁধনা পরবের আগমনী। এই আগমনী গানে মাঠ-ঘাট গোচারণভূমি সব যেন মেতে ওঠে। বাঁধনা পরবের কয়েকটি বিভাগ আছে যেমন জাড়িয়া, গরয়া পূজা বা গোহাল পূজা, বুড়ি বাঁদনা, কাঁটা ফেডা, গরু খুঁটা ইত্যাদি।

জাওয়া হ'ল অমাবস্যার দিনের প্রস্তুতি। এইদিন থেকেই গরুর অথবা কাড়ার শিঙে তেল দেওয়া আরম্ভ হয়। অমাবস্যার দিন সূর্য অস্তগত হবার সঙ্গে সঙ্গে অল্পবয়সী ছেলে মেয়েরা পাটকাটি, মশাল, ভেরেণ্ডা বীজের মালা ইত্যাদি নিয়ে গাঁয়ের প্রান্তে চলে যায় ইঁজই পিঁজই খেলতে। তারা মুখে বলে, 'ইঁজইরে পিঁজইরে ব্যানা বুড়ীর বান কাটইঁরে'। তালে তালে নাচতে থাকে তারা এবং মশালের আগুন হাতে ছুটাছুটি করে। রাত্রি অধিক হলে একটা জায়গায় আগুন জ্বালে এবং তিনবার লাফ দিয়ে তা পারাপার করে আর ছড়া বলে—

দাওদা বুড়াই দাদ লে
খউসা বুড়াই খউস লে।

এরপর যে যার সব ঘরে ফিরে আসে। দ্বারে দ্বারে গুঁড়ীর প্রদীপ, মড়রা ঘাস ইত্যাদি সন্ধ্যার আগেই দিয়ে দিতে দেখা যায়। গিন্নীরা ব্যস্ত থাকেন পিঠে তৈরীর কাজে। সব কাজ শেষে গরু মহিষের শিঙে তেল মাখিয়ে তারপর কুলুঙ্গিতে জেলে দেওয়া হয় জাগর। জাগর যাতে না নেভে সেদিকে নজর রাখা হয়। কারণ প্রচলিত বিশ্বাস—এই জাগর নিভে গেলে নাকি পরিবারের অকল্যাণ হয়। রাত্রে বের হয় ঝাঁগড়ের দল। তারা সঙ্গে নেয় ঢোল, মাদল, ধামসা ইত্যাদি। ঝাঁগড় দলের কাজ হ'ল প্রতি বাড়ী গিয়ে নহিরা গান গেয়ে গাভী জাগান। গৃহকর্তার কাজ হ'ল এই ঝাঁগড় দলকে আপ্যায়িত করা। এদের পিঠে খেতে দেওয়া হয়।

পরের দিন হ'ল গরয়া। এইদিন সারাটা সকাল ধরে লেহাগী খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে দল বেঁধে সকলে গ্রামের বাইরে গিয়ে সমগ্র গ্রামের অমঙ্গলজনক সব কিছু ফেলে দিয়ে আসে। লেহাগীর দল গ্রাম ত্যাগ করে গেলে গ্রামের মানুষ বাড়ীর ভাঙ্গা কুলো, ঝাঁটা, ঝুড়ি, বেগুন, মূলা

ইত্যাদি ফেলে দেয়। তাছাড়া ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের এমনভাবে রাস্তায় শুইয়ে দেওয়া হয় যাতে লেহাগীর দল তাদের ডিঙ্গিয়ে পার হয়ে যেতে পারে। বিশ্বাস, এর ফলে ছেলেমেয়েদের আর খোস প্যাঁচড়া হবে না।

এদিকে গ্রামের বাইরে অমঙ্গলজনক সব কিছু ফেলে আসার পর পুরুষেরা হাল, মই, জোয়াল ইত্যাদি জলে ধুয়ে এনে তুলসীতলায় রেখে দেয়। তারপর স্নান না করে তৈরী করা হয় ধানের মৌড। গরয়া পূজার জন্য প্রয়োজন সুঁদি শালুকের ফুল। এই পূজার জন্য প্রয়োজন হয় পিঠার, আর তা প্রস্তুত করে বিবাহিতা মেয়েরা। পুরুষদের তৈরী করতে হয় গোবর্ধন পর্বত। কারণ এই পর্বত গোয়াল ঘরে না আনলে পূজা করা যায় না। গরয়ার পরের দিন হয় বুড়ী বাঁদনা এবং গরু চুমানো। বিবাহিতারা অভুক্ত অবস্থায় স্নান সমাপনান্তে নতুন কাপড় পরিধান করে নতুন কুলোতে করে ধান দূর্বা, সিঁদুর, কাজল, ধূপ, দীপ, ধানের মৌড, সরষে, গোবর ইত্যাদি নিয়ে গরু চুমাতে উপস্থিত হয় গোয়ালে। তাদের সংগে থাকে ঘটি ভর্তি হলুদের জল। এই সময়ে পুরুষদের সাহায্যে গরুর শিঙে তেল মাখান হয়। তাছাড়াও সিঁদুর দেওয়া, মৌড পরানোর মত ব্যাপারগুলি পুরুষদের সহায়তায় সম্পন্ন করা হয়। গোয়াল ঘরের দরজায় এবং গরু ও সগালের মাথায় তেল ঢেলে দেওয়া হয়। গোট বেগুন এনে গোট পূজাও করা হয়। ঝাঁগড়ের দল গাইতে থাকে গরু চুমানোর গান। বিকালে অনুষ্ঠিত হয় গরু কাড়া ফুটানোর পালা।

একটা শক্ত খুঁটিতে বাঁধা হয় বলিষ্ঠ গরু বা মোষকে। তাদের লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। বাজতে থাকে ঢোল, ধামসা, মাদল। চলে গান। বাঁদনা পরব উপলক্ষ্যে রাখাল বালক এবং যে গরু-মোষের দেখা-শুনা করে অর্থাৎ এদের মলমূত্রাদি পরিষ্কার করে, গোয়াল পরিচর্যা করে, তাকে নতুন কাপড় দেওয়ার রীতি।

বাঁদনা উপলক্ষ্যে গরুকে সাজান হয় বেশ করে। শিঙে তেল ও সিঁদুর দেওয়া ছাড়াও এদের গায়ে নানা রঙের ছাপ দেওয়া হয়। গেরু ও গুঁড়ির ছাপ অবশ্যই থাকে। গরুর গলায় পরান হয় গাঁদা ফুলের মালা আর মাথায় দেওয়া হয় ধানের মৌড় বা মুকুট।

মহামায়ী দেবী

পুরুলিয়া জেলার ঝালদা থানার অন্তর্গত কাঁসরা গ্রামে একটি লৌকিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যে দেবীর পূজা হয়, তাঁর নাম মহামাযী দেবী। স্থানীয় অঞ্চলে মহামাযী দেবী বসন্ত রোগের দেবী রূপে কল্পিত এবং অর্চিত হয়ে থাকেন। মহামাযী দেবীর পূজা হয় বৎসরে একবার, মাঘ মাসের ১০ তারিখ। এই দেবীব সংগে পূজিত হন আবও তিন দেবতা। এঁরা হলেন যথাক্রমে ভেলগুরু, দেশোহল এবং উদুর। প্রধানতঃ নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দ্বাবাই এই পূজার আযোজন হয। এমনকি এই পূজায পৌরোহিত্য কবে থাকেন একজন অব্রাহ্মণ। এঁকে বল হয় নাযা।

একটি ছোট পাথরকেই দেবী রূপে কল্পনা করা হয। পূজার দিন দেবীর ওপর একটি আচ্ছাদন দেওয়া হয়। এর নাম হ'ল ছামডা। শালগাছেব ডালপালা দিয়ে এই আচ্ছাদন প্রস্তুত করা হয়।

মহামাযী দেবীর পূজায বলিদান দেওযা হয। বলিদান দেওয়া হয় পাঁঠার পবিবর্তে পাঁঠী। অন্য তিন দেবতাব কাছেও বলি দেওয়া হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন পশু। যেমন ভেলগুরুব কাছে বলি দেওযা হয পাঁঠা, দেশোহল ঠাকুরের কাছে বলি দেওযা হয ভেডা এবং উদুর কাছে বরাহ। এছাডাও গ্রামবাসী মাহাতো প্রভৃতিরা মহামাযী দেবীর কাছে পায়রা ইত্যাদি বলি দেয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী এই চার দেব-দেবী গ্রামের চারট দিক রক্ষা করেন। কে কোন দিক রক্ষা করেন, তারও নির্দিষ্ট বিশ্বাস রয়েছে। উত্তর দিক রক্ষা করেন দেশোহল ঠাকুর, দক্ষিণ দিক রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত স্বয়ং মহামায়ীর ওপর, পূর্ব দিকের রক্ষাকর্তা উদুর এবং পশ্চিমদিকের রক্ষক হলেন ভেলগুরু।

এইসব দেবদেবীদের প্রভাবে গ্রাম রোগ কিংবা মহামারীর কবলিত হয়না বলে বিশ্বাস।

মহামায়ী এবং অন্যান্য দেবতার পূজা শুরু হয় বেলা ১২টায়, আর তা চলে সন্ধ্যা পর্যন্ত। পূজা উপলক্ষ্যে বেশ আকর্ষণীয় মেলাও বসে।

এই পূজার উপাসক যে কোন বয়সীর হতে কোন বাধা নেই। উপাসকদের বলা হয় চেটিয়া। পূজার দিন উপাসকদের উপবাসে থাকতে হয়। কাছের কোন জলাশয়ে স্নান করে তারপর এরা মহামায়ীর ছামড়া পর্যন্ত গণ্ডি কাটে।

এরপর এরা কড়াতে অল্প তেলে ভাজা চালের গুঁড়ির পিঠে গরম কড়া থেকে নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে ভক্ষণ করে। এরপর বৈঁচি কাঁটার ডাল দিয়ে নিজেদের পিঠে মারতে থাকে। এমন কি এই কাঁটার ওপর গড়াগড়িও খায়। তারপর এরা মহামায়ীকে পরিক্রমা করে। এই সময়ে বাজতে থাকে ঢোল, নাকাড়া ইত্যাদি। আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকেই উপাসকদের এই পূজায় অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়।

রহিণ পূজা

পুরুলিয়া জেলায় জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৩ তারিখটিতে অনুষ্ঠিত হয় রহিণ পূজা। স্বভাবতঃই ১২ই জ্যৈষ্ঠ হ'ল রহিণ পূজার প্রস্তুতির দিন। মূলতঃ কৃষিকার্যের সঙ্গে এই পূজার যোগ। এই দিনটিতে চাষীরা 'বীচ পূজা' করে থাকে। অর্থাৎ বীজ বপনের কাজের শুভারম্ভ হয় এইদিন। এমনকি যদি কারো বাড়ীতে এই সময় অশৌচ চলতে থাকে, সেক্ষেত্রে অন্যের সাহায্যে বীচ পূজার কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী ১৩ই জ্যৈষ্ঠ পৃথিবীতে রোহিণী নক্ষত্রের প্রভাব পড়ে সর্বাধিক। তাই এই সময়ে বীজ বপন করলে বীজ তোলার শস্যে নাকি কোন রোগ আক্রমণ করতে পারে না। আর তাছাড়া এইদিন বীজ বপন করলে শস্য উৎপন্ন হয় প্রচুর এবং উৎপন্ন ফসলের বীজগুলিও খুব পুষ্টতা লাভ করে।

এইদিন একদিকে যেমন বাড়ীর মেয়েদের খুব ব্যস্ততা দেখা যায়, তেমনি ব্যস্ত দেখা যায় গৃহস্বামীদের এবং বাড়ীর ছেলে পুলেদেরও। গৃহস্বামীরা ব্যস্ত থাকেন এইদিন রহিণ ফল সংগ্রহে। লোক বিশ্বাস হল রহিণ পূজার দিন রহিণ ফল খেলে সে বছর সাপের বিষ কোন ক্ষতি করিতে পারে না। এইকারণে পরিবারের সকলকে রহিণ ফল খাওয়া বার দায়িত্ব পালন করেন গৃহস্বামী। বলাবাহুল্য সর্প সঙ্কুল বাংলোদেশের সর্প ভীতি রহিণ পূজার উদ্ভবের মূলে রয়ে গেছে,শুধুমাত্র কৃষির সঙ্গেই যে এই পূজার সম্পর্ক, তা নয়। তাছাড়াও পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী গৃহকর্তাকে বীচ পূজার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ বীজ বার

করতে হয় নির্দিষ্ট সময়ে। কোন সময় বীচ পূজার পক্ষে ভাল তা মেষ বলি দিয়ে আগে থেকেই জেনে নেওয়া হয়। এও গৃহস্বামীরই কাজ। প্রসঙ্গত একটা কথা বলে নিতে হয়। পরিবারের মধ্যে যার আয় সর্বাধিক এবং ব্যয় স্বল্প তাকে দিয়েই বীজ বপন করান হয়।

এইবার মহিলাদের প্রসঙ্গ। ভোর বেলায় পূজার দিন মেয়েদের প্রথমেই ঘরের সংলগ্ন উঠান এবং মেঝেয় গোবর দিতে হয়। তাছাড়া বাড়ীর দেওয়ালের চারদিকে গোবর গোলা জল দিয়ে আঁক দিতে হয়। উদ্দেশ্য, অশুভ শক্তি যাতে গৃহে প্রবেশ না করে। তাছাড়া ক্ষেত থেকে নতুন ঝুড়িতে করে মেয়েদেরই রহিণ মাটি সংগ্রহ করে আনতে হয়। পুকুরে স্নান করে ভিজে ঝুড়ি ভর্তি করে মাটি আনতে হয়।

মাটি আনার সময় কিন্তু সম্পূর্ণভাবে মৌনতা অবলম্বন করতে হয়। দ্বিতীয়ত মাটি আনার সময় তা কাচা কাপড়—অথবা গামছার দ্বারা ঢেকে আনতে হয়। তৃতীয়ত, মাটি আনতে হয় মাথায় করে। সর্বোপরি মাটি সংগ্রহ করতে হয় নিজেদের চাষের জমি থেকে। মাটি আনয়নের পর ঐ মাটি পবিত্র স্থানে দেবতার থানে অথবা তুলসীর মূলে দিয়ে দিতে হয। তারপর তুলসীতলা থেকে মাটি নিয়ে প্রতিটি ঘরে এমন কি গোয়াল ঘরেও চালের তলায় সযত্নে রেখে দেওয়া হয়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে রহিণ পূজার সঙ্গে সর্পদংশন জনিত ক্ষত নিরাময়ের এক সম্পর্ক আছে। স্থানীয় বিশ্বাস অনুযায়ী সর্পদষ্ট ব্যক্তির ক্ষতস্থানে রহিণ পুজো উপলক্ষে আনীত মাটি দিলে সহজেই ঐ ব্যক্তি নিরাময় লাভ করে। পুরুলিয়ায় ওঝারা সর্পাঘাতে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা কার্যে এই মাটি ব্যবহার করে থাকে। আর এই পূজা উপলক্ষে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ থেকে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতিদিন রাত্রে নিয়মিতভাবে 'মনসামঙ্গল' গান গীত হয়ে থাকে। এতদঞ্চলের অধিবাসীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, রহিণ পূজার দিন সকল প্রকার সাপ গর্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। পুনরায় আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির মধ্যে সাপেরা গর্তে আশ্রয় নেয়। রহিণ পূজার দিন বৃষ্টি হলে নাকি সাপেদের আর বিষ থাকে না।

রহিণ পূজার দিন গৃহস্বামী রাত্রে ভাতের পরিবর্তে দুধ, চিঁড়ে, রহিণফল ইত্যাদি—সর্পদেবী বা মনসার নাম ভক্তিভরে স্মরণ করে ভোজন করেন। আর একটি কথা, মাটি আনার সময়ে যদি কেউ কথা বলে ফেলে, এমন কি যদি কেউ [illegible] ফেলেন, তাহলে সংগৃহীত মাটি সব ফেলে দিতে হয়।

পুনরায় স্নান করে নতুন মাটি ঝুড়িতে ভরে নিয়ে আসতে হয়। নতুবা পরিবারের অকল্যাণ হয়।

এইবার রহিণ পূজায় বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেদের কি ভূমিকা দেখা যাক। এইদিন ছেলেরা ছেঁড়া কাপড়, কাঁথা পরে, গায়ে মুখে কালি ঝুলি মেখে বিভিন্ন প্রকার জন্তুর মুখোস পরে মেয়েরা যখন রহিণ মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে আসে, তখন তাদের দেখিয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করে। কচিৎ যদি মেয়েরা হেসে ফেলে তাহলে তাদের স্নান করে আবাব নতুন ভাবে মাটি আনতে হয়। এছাড়া ছেলেরা বাড়ী বাড়ী গিয়ে নাচ দেখিয়ে পয়সা, চাল ইত্যাদি আদায় করে।

রহিণের দিন গ্রামের মানুষ আনন্দ করে দুপুরে ও সন্ধ্যায় মাছ, মাংস, পিঠে ইত্যাদি আহার করে। এইদিন যারা মন্ত্রতন্ত্রের কারবারী, তারা তাদের শেখা মন্ত্রতন্ত্রগুলি ঝালিয়ে নেন। তাছাড়া এইদিন অনেকে ওঝার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মন্ত্র-তন্ত্র শেখার জন্য। অনেকে বিশ্বাস করে যে এই দিনই নাকি বলরামের নাক দিয়ে অনন্ত নাগ বের হয়েছিল এবং বলরাম মৃত্যু বরণ করেন।

বলরাম লাঙ্গলধারী। তাই এর সঙ্গে কৃষির সম্পর্ক অনুমিত হয়। আর এই বলরামের মাতার নাম রোহিণী। এই কারণে কেউ কেউ মনে করেন যে কৃষি দেবতা বলরামের মাতার নামানুসারে বীজ বপনের প্রথম দিনটিকে 'রহিণ' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

পুরুলিয়ার মত মেদিনীপুরেও রহিণ পূজার প্রচলন আছে। তবে এখানে শুধুমাত্র জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৩ তারিখ না হয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ১৩ দিন একটানা আড়ম্বরের সঙ্গে রহিণ উৎসব হয়ে থাকে। মেদিনীপুরে রহিণ পূজার অপরিহার্য উপকরণ হিসাবে পূজার স্থানে একটি থালায় কিছু জলন্ত টিকে রেখে দেওয়া হয়। আর ঐ আগুনে দেওয়া হয় প্রচুর ধুনো। 'ধূপর' বা পুরোহিত প্রথমে ঐ আগুন এক নিঃশ্বাসে শুষে নেন বা নিভিয়ে ফেলেন। তার পরই শুরু হয় মনসামঙ্গলের গান।

চকড়াসিনি

পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত 'ভসমকাটা' নামক স্থানে এক আঞ্চলিক দেবীর পূজানুষ্ঠানের রীতি প্রচলিত পয়লা মাঘ তারিখটিতে। ইনি স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে পরিচিত 'চড়কাসিনি দেবী' নামে। এই দেবীর নিজস্ব কোন মূর্তি

নেই। একটি প্রস্তরখণ্ডকেই দেবীরূপে কল্পনা করে পূজা করা হয়ে থাকে। দেবীর পূজার্চনার অব্যবহিত পূর্বে একটি বিশেষ প্রথা অনুসৃত হতে দেখা যায়। প্রথাটি এই রকম।

একটি প্রস্তর খণ্ডকে 'বিছাল' দড়ি দ্বারা বেঁধে দেবীর চালা ঘরের সম্মুখে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। পাথরটি আপনা থেকে মাটিতে পড়ে গেলে তবেই দেবীর পূজা আরম্ভ হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রস্তরখণ্ডটিকে বিছাল দড়ি দিয়ে এমন ভাবে আবদ্ধ করা হয়, যাতে সহজে প্রস্তরটি খুলে পড়ে না যায়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী পাথরটি বিছাল দড়ির বেষ্টন থেকে মুক্ত হয়ে ভূমিতে খসে পড়ার মাধ্যমেই পূজাস্থানে দেবীর আবির্ভাব সূচিত হয়।

খইচেরা

শ্রাবণ মাসের যে কোনও শনি অথবা মঙ্গলবারে পুরুলিয়া জেলার প্রায় সর্বত্রই একটি পূজানুষ্ঠান বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। স্থানীয় ভাবে এই পূজানুষ্ঠানের নাম 'খইচেরা'। আসলে এটি সর্পদেবী মনসার পূজা।

খইচেরার দিন সকল প্রকার সাংসারিক কাজকর্ম ও চাষ-বাস স্থগিত রাখা হয়। খইচেরার দিন মনসাগাছ থেকে একটি ডাল ভেঙ্গে এনে সেটিকে তুলসী তলায় পুঁতে দিয়ে তারপর ভক্তিভরে সেটিকে পূজা করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহস্থ স্বয়ং এই পূজা করে থাকেন। আর কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের দ্বারাও এই পূজা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

পূজায় উপকরণ হিসাবে আমলকী পাতা, বেল পাতা, জবাফুল, করবীফুল প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। এই দিনটিতে গৃহস্থেরা ভাত খায়না। তৎপরিবর্তে দু'বেলাই চিঁড়ে, মুড়ি, খই ইত্যাদি আহার করে থাকে। রাত্রে হয় মনসামঙ্গলের গান। মনসামঙ্গলের সঙ্গে বাজে এক প্রকার বাজনা—এর নাম 'বিষম ঢাক'। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত 'মনসামঙ্গল'ই এতদঞ্চলের বহু পঠিত ও প্রচলিত মঙ্গলকাব্য।

বীরভূম

সুভিক্ষা

বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের পশ্চিমে তিন কিলোমিটার দূরে অজয় নদীর উত্তর দিকে সুপুরের পশ্চিম প্রান্তে সুভিক্ষা দেবীর মন্দির অবস্থিত।

সত্যযুগে মেধস মুনির আশ্রম অবস্থিত ছিল বর্তমানের মুসলমান অধ্যুষিত মহিদাপুর নামক গ্রামে। মেধস মুনির প্রেরণায় রাজা সুরথ সুপুর গ্রামে সুভিক্ষা দেবীর পূজার প্রথম আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে লক্ষ ছাগ বলি দেবার জন্য পর্যায় ক্রমে বলিকাষ্ঠের খুঁটি সুপুরের পূজা মণ্ডপ থেকে উত্তরাভিমুখে বসাতে বসাতে বর্তমানে যে শহর বোলপুর নামে খ্যাত, ঐ পর্যন্ত আসে। একলক্ষ ছাগ বলি দেওয়ার কারণেই 'বলিপুর' থেকে সংক্ষেপে বোলপুর নামকরণ হয়। রাজা সুরথ রাজ্যহারা হয়ে উদাসীন অবস্থায় ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত মেধস মুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত হন এবং মেধস মুনির চণ্ডীপাঠ শুনে ভক্তিবিনম্র চিত্তে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলে মুনি তাঁকে দেবী পূজার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অতঃপর দেবীপূজা করে দেবীর কৃপায় রাজা সুরথ তাঁর হারান রাজ্যসম্পদ লাভ করেন। এই ঘটনা উপলক্ষ্যেই দেবী 'সুভিক্ষা' নামে খ্যাত হয়ে থাকবেন। অনেকে আবার সুবিক্ষাও বলে থাকেন।

সুরথ রাজার রাজত্বের পর তাঁর আমলের মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। তখন স্থানীয় জমিদার দেবীর নিত্য পূজার ব্যবস্থা করেন। দেবীর নিত্য সেবা পূজার উপযোগী একটি ছোট মন্দিরও নির্মিত হয়। অতঃপর সেই মন্দিরটিও ধ্বংসে পরিণত হলে পরবর্তীকালে স্থানীয় জমিদার তাঁর শ্বশুর ননীগোপাল গুপ্তের ঐকান্তিক ভক্তি বলে ধ্বংস স্তূপের ওপরে আর একটি ছোট মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন। জমিদারী থাকা পর্যন্ত জমিদারী স্টেট থেকেই দেবী পূজার ব্যয় নির্বাহ হ'ত। কিন্তু জমিদারী প্রথা বিলোপের পর যখন দেবীর সেবা বন্ধ হবার উপক্রম হয়, তখন স্থানীয় গ্রামবাসীরা দেবী পূজার ব্যাপারে এগিয়ে আসেন।

দেবীর মন্দিরে কোন মূর্তি দেখতে পাওয়া যায় না। এখানে কেবল একটি

হাত বিখণ্ডিত অবস্থায় আছে। দেবীকে স্মরণ করে এই হাতটিরই নিত্য পূজা হয়। পূজা করেন ব্রাহ্মণে। দেবী চণ্ডীরই অপরা মূর্তিরূপে সুভিক্ষা পূজিতা হন। ধর্মমঙ্গলেও সুবিক্ষা নামে এক দেবীর উল্লেখ দেখা যায়।

বর্তমানে যিনি দেবীর নিত্য সেবার দায়িত্বে আছেন, তিনি হলেন শ্রীঅবধূত মহান্ত। ইনি জমিদার আমল থেকেই পৌরোহিত্য করে আসছেন।

সুপুরের পূর্বদিকে 'রজতপুর' নামে একটি গ্রাম আছে। এখানে দেবী মহামায়া মূর্তির শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে চারদিন ব্যাপী পূজা হয়। নবমী পূজার দিন পূজার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি এনে সুভিক্ষা দেবীর মন্দিরে হোম যজ্ঞাদি করে যোড়শ প্রচারে এখনও পূজা হয়। এই দিন বলি হয় একটি।

সুপুর গ্রামের উত্তরে চার ক্রোশ দূরে শাল-তরুসমাচ্ছন্ন একটি সুবৃহৎ অরণ্য দৃষ্টিগোচর হয়। এ'টি পরিচিত 'ডুমুরাবন' নামে। অনেকে বলে থাকেন এই বনেই নাকি মেধস মুনির আশ্রম ছিল। এখানে 'বাঘরায় চণ্ডী' নামে এক দেবী মূর্তি বিরাজিতা আছেন। এ স্থান থেকে একটি সুবৃহৎ তাম্রাধার পাওয়া গেছে। এটি দেখতে আধুনিক ডেকের অনুরূপ। বাঘরায় চণ্ডী নাকি মেধস মুনি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন।

বর্তমান সুভিক্ষা দেবীর মন্দিরের দুই কিলোমিটার দূরে সুরথেশ্বর নামীয় এক শিবমন্দির অধিষ্ঠিত। এই মন্দিরে চারটি শিব লিঙ্গ অবস্থিত। এখানেও নিত্য পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বাহা পরব

সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত নানা উৎসবের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হ'ল বাহা পরব। 'বাহা' শব্দটির অর্থ হ'ল ফুল। অতএব বাহা মানে ফুলের উৎসব। যদিও 'বাহা' হ'ল উৎসব, তবু এই উৎসবে প্রধানতঃ যে দু'টি ফুলের প্রয়োজন তা হ'ল শাল এবং মহুয়া।

উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় ইংরেজী ফেব্রুয়ারী, মার্চ মাস নাগাদ। সাঁওতালদের হিসাবে এই সময়ে নববর্ষের শুরু। মোটামুটিভাবে বলা যায় মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের প্রথমা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত যে সময় তা পরিচিত 'বাহা বোঙা' বা 'বাহা মাস' নামে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে মাঘ মাস থেকেই সাঁওতালদের

নববর্ষের সূচনা। এই সময়ে নতুন নতুন ফুল ফোটে, গাছে গাছে দেখা দেয় নতুন কচি সবুজপাতা। বাহা পরবের আগে সাঁওতালরা নতুন কোন ফল, ফুল কিংবা পাতার ব্যবহার করেন না। যেমন বাঙালী হিন্দুরা নবান্নের আগে নতুন ধান কিংবা গুড় নিজেদের ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগায় না। কিংবা আম বারুনির আগে যেমন অনেকেই আম খায় না, সরস্বতী পুজোর সময়ে নতুন ফল ফুল সরস্বতীকে নিবেদন না করে খাওয়া নিষেধ। প্রকৃতি যে সব নতুন উপহার সামগ্রী আমাদের দেয়, প্রথমে সেগুলিকে দেবতার নামে উৎসর্গ করে তবেই মানুষ নিজের কাজে তা লাগায়। বলা চলে এক ধরণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। প্রকৃতির দান অর্থে ভগবানেরই দান, তাই ভগবানকে নিবেদন করে তবেই তাতে আমাদের অধিকার জন্মায়।

উৎসবটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আমরা অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করতে পারি। শীতের অব্যবহিত পরেই গাছপালা যেমন নতুন ফল ফুল ও পাতায় সজ্জিত হয় এবং সেই সঙ্গে জীব জগতের বৃহত্তর কল্যাণে লাগে, তেমনি বাহা পরবের অংশ-গ্রহণকারীরাও দেবতার কাছে প্রার্থনা জানান তাঁদের জীবন যেন জীবজগতের বৃহত্তর কল্যাণে নিযুক্ত হয়ে সার্থকতা লাভ করে। বাহা পরবের তাৎপর্য সম্পর্কিত আলোচনার পর এইবার আমরা এই উৎসবের অন্যান্য বিষয়ের পরিচয় গ্রহণ করতে পারি।

জাহের এরা, মঁড়েকো তুঁরুইকো, মারাং বুরু প্রমুখ আত্মাদের খুশী রাখতেই বাহা পরবের অনুষ্ঠান। উদ্দেশ্য, এদের প্রভাবে নিজেরা, সেই সঙ্গে গ্রাম এবং চারপাশের মানুষজন এবং বিভিন্ন গৃহপালিত প্রাণী যাতে রোগমুক্ত থাকতে পারে। পূজানুষ্ঠানে সব গ্রামবাসী অংশ গ্রহণ করলেও প্রত্যক্ষভাবে পূজানুষ্ঠান অর্চিত হয় নায়কের দ্বারা। সাঁওতালদের পুরোহিত 'নায়ক' নামে পরিচিত। শাল গাছের তলায় বা জাহের থানে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বলে রাখা ভাল থানের শাল গাছটিতে যেন দু'টি ভাগ থাকে। অর্থাৎ মাটির ওপর থেকে যেন দুদিকে দুটো গাছ সমান ভাবে থাকে।

উৎসবের মেয়াদ তিনদিন। প্রথম দিন হল উম্। এইদিন সবকিছু পরিষ্কার করতে হয় অর্থাৎ উপযুক্ত পরিবেশ রচনার দিন। এইদিন থেকেই সব দিক দিয়ে মনকেও পবিত্র রাখতে হয়। দ্বিতীয় দিনে হয় সার্দি। অর্থাৎ পরিপূর্ণতার দিন। প্রকৃত পূজা এইদিনই অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত হয় নাচ, গান ইত্যাদি। নৃত্যে মহিলা এবং পুরুষেরা একসঙ্গে যোগদান করে না।

মহিলা এবং পুরুষেরা পৃথক পৃথক ভাবে নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে থাকে। ধামসা-মাদলের দ্রিমি দ্রিমি তালে নাচ হয়। পুরুষের মাথায় থাকে ময়ূরের পালখ, পায়ে থাকে ঘুঙুর। অপর পক্ষে মহিলাদের খোঁপায় থাকে লালফুল। কানেও তাদের লালফুল দেখতে পাওয়া যায়। গলায় থাকে বাহারি ফুলের মালা।

তৃতীয় দিনে হয় বাস্কে। পূজার সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয় এইদিন। পূজায় বাজে ধামসা, মাদল, শিঙ্গা এবং অন্যান্য নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র। পূজায় মুরগী বলিদান করা হয়। ঠিক বলিদানের সময় ধামসা এবং মাদলের বাজনা বন্ধ হয়ে যায়। তখন শুধু বাজতে থাকে শিঙ্গা এবং চলতে থাকে গান। গান বলতে দীর্ঘদিন ধরে যা প্রচলিত হয়ে এসেছে, সেগুলিকেই বোঝায়। অর্থাৎ গানগুলি হওয়া চাই traditional।

পুরোহিত এই পূজায় পবিত্র জল যাদের ওপর দেবতা ভর করেন, তাঁদের ওপর ছিটিয়ে দেন। বিপরীতক্রমে ভর হওয়া মানুষেরাও ঐ একই জল পুরোহিতের গায়ে দিয়ে দেয়। ভর হওয়া মানুষেরাই পূজার জন্য প্রয়োজনীয় শাল, মহুয়া ইত্যাদি ফুল সংগ্রহ করে থাকেন।

বাস্কের দিনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাহের এরার হাতের কাঁটা, মারাং বুরুর হাতের টাঙ্গি এবং মঁড়েকো তুঁরুইকোর হাতের সড়কি নায়কে পরবর্তী বৎসরের জন্য নিয়ে যত্ন করে তুলে রাখেন।

বাহা উৎসবের দ্বিতীয় দিনে খিচুড়ী খাওয়ার রেওয়াজ। গাছের তলায় খিচুড়ী রান্না করা হয় এবং খিচুড়ী দু'ভাগে তৈরী হয়। এক ভাগ হয় নায়কের জন্য, আর এক ভাগ জনসাধারণের জন্য। খিচুড়ী প্রথমে পূজায় উৎসর্গ করতে হয়। তারপর তা জনসাধারণ খেতে পাবার অনুমতি পায়। খিচুড়ীর সঙ্গে পূজায় উৎসর্গীকৃত মুরগীর মাংসও ভক্ষিত হয়।

বাহা পরবের নির্দিষ্ট দিনটি গ্রামবাসীরা সমবেতভাবে স্থির করেন। তারপর নায়কেকে তা তাঁরা জানিয়ে দেন পূর্ব প্রস্তুতির জন্য। এই প্রসঙ্গে নায়কেকে যে ভাবে সতর্ক করে দেওয়া হয়, তার কিছু পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে—

হেঁদাঃ মা চটেরে যা গসায় তুদেদয় রাগেকান
বাড়ে মা লাড়েরে যা গসায় গুত্‌রুদদয় সাহেদ্‌কোন
দেশ চং আচুরেন যা গসায় তুদেদয় রাগেকান
দিশম চং বিজুরেন যা গসায় গুত্‌রুদদয় সাহেদ কান।

আতেন মেমে নায়কে এরা যা গসায় তুদেদয় রাগে কান
আজম মেসে নায়কে এরা যা গসায় গুত্রুদদয় সাহেদ কান।

উদ্ধৃতাংশটির অর্থ হ'ল—

অশ্বত্থ গাছের ওপরে তুংপাখী ডাকে
বটবৃক্ষের আবডালে হে দেবতা, গুতরুদ্ হাঁকে
ঋতুর পরিবর্তন হল হে দেবতা, তুৎপাখী ডাকে
নববর্ষ ফিরে এল হে দেবতা, গুতরুদ্ হাঁকে।
ওগো নায়কে এরা, শ্রবণ করো, ঐযে তুৎ ডাকে
শোন গো নায়কে এরা, ঐ যে গুতরুদ্ হাঁকে।

'তুৎ' হ'ল এক ধরণের পাখী। আর গুতরুৎ হ'ল নরসিংহ। পূজার তিন দিন আগে থেকে পুরোহিতকে খুব পবিত্রভাবে থাকতে হয়। এই সময়ে তিনি ফুল গাছের শয্যায় শয়ন করেন, পবিত্র বস্ত্র পরেন, আর মাটির হাঁড়িতে নিজে ভাত রেঁধে খান।

বাহা পরবে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তার মধ্য দিয়ে মানুষের চিরন্তন বাসনার প্রতিফলন লক্ষিত হয়। নিবেদিত প্রার্থনার মূল বক্তব্য হ'ল—

হে দেবদেবী, বাহা উৎসবের নামে আপনাদের কাছে রানদাঃ (মহুয়া), তাপানদা ঃ (হাড়িয়া), শালফুল, মহুয়া ফুল ইত্যাদি উৎসর্গ করছি। আনন্দ সহকারে গ্রহণ করো। আমাদের জীবন তোমাদের আশিসে সুখময় হয়ে উঠুক। সময়ে বৃষ্টি আসুক। রোগ শোক থেকে আমাদের দূরে রাখ।

বাহা পরবে সকলেই নিজনিজ আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করেন। গৃহকর্তা সকলের জন্য নতুন বস্ত্রের ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেই নতুন বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পূজানুষ্ঠানে যান। এটাই তাঁদের রীতি।

বাহা পরব যে শুধু বীরভূমের নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় তা নয়, অন্যান্য জেলায় যেখানে সাঁওতালদের বাস, সেখানেও এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে ঝাড়গ্রামের নাম করতে হয়।

ঝুমকেশ্বরী

বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার অন্তর্গত নিচিন্তিপুর মৌজায় এই লৌকিক দেবীর অধিষ্ঠান। রামপুরহাট রেলওয়ে স্টেশন থেকে পশ্চিম দিকে তিন কিলোমিটার দূরত্বে দেবীর মন্দির। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা নিমতিতা স্টেটের জমিদার। মন্দিরটি তৈরীর আগে দেবীর অধিষ্ঠান ছিল প্রাচীন নিম ও শেওড়া গাছের তলায় অবস্থিত একটি বেদীতে। স্বপ্নাদেশে পরে পাকা মন্দিরটি নির্মিত হয়। প্রথমে মন্দিরটি ছিল উত্তরমুখী। কিন্তু পুনরায় স্বপ্নাদেশ পাওয়ায় মন্দিরটি দক্ষিণমুখী করে নির্মিত হয়। বলাবাহুল্য এখনও মন্দিরটি এই দক্ষিণ-মুখী অবস্থাতেই বিদ্যমান। মন্দিরটি দেখে মনে হবে এ'টি অসমাপ্ত। আনু-মানিক বার তের বিঘা জমি নিয়ে এই মন্দির। মন্দিরের দক্ষিণে প্রবাহিত খাল, স্থানীয় নাম কান্দর। খালটি 'ত্রিবেণী' নামেও পরিচিত। ত্রিবেণীর জল নীল এবং বেশ পরিষ্কার। বহু প্রাচীন কয়েকটি শিমূল ও অন্যান্য গাছে ভরা জঙ্গল মধ্যে শ্মশান।

মন্দিরের পুরোহিত কান্দরা গ্রামের নলিনী চক্রবর্ত্তী। বহুদিন ধরেই ইনি এখানে পৌরোহিত্য করছেন। ঝুমকেশ্বরীর সম্পূর্ণ মূর্তিটি পাথরের। ক্যানাল ডিপার্টমেণ্টের জনৈক এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার হরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মূর্তিটির প্রতিষ্ঠাতা। মূর্তিটি আসলে কালীর। মূর্তির সামনের দিকে তৈরী দু'টি সাপ। ১লা মাঘ খুব সমারোহের সঙ্গে দেবীর পূজার্চনা হয়। পূজা হয় দিনের বেলাতেই। বৎসরের অন্যান্য সময় দেবীর কিন্তু নিত্যপূজা হয় না। কেবল প্রতি অমাবস্যায় দেবীর পূজা হয়. তাও হয় দিনের বেলাতেই, রাতের বেলায় নয়। ঝুমকেশ্বরীর কাছে কেউ রাত্রিবাস করতে পারেনা। দেবীর পূজা ব্রাহ্মণে করেন, কিন্তু মায়ের কাছে কোন বলি দেওয়া হয় না। জায়গাটি একেবারে জনমানবশূন্য। ১লা মাঘ যখন দেবীর বর্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়, সেদিন এই উপলক্ষে মেলা বসে। আগে মেলা বেশ কয়েকদিন ধরে চলত। কিন্তু বর্তমানে মেলা চলে মাত্র ঐ একদিনই।

'ত্রিবেণী' নামকরণের কারণ কান্দর বা খালের সম্মুখ ভাগ দেখতে অনেকটা তিনটি বেণীর মতন তাই। সংলগ্ন স্থানে শবদেহ দাহ করা হয়। সেচবিভাগের ইঞ্জিনীয়াররা এখানে একটি গভীর খাদের সন্ধান পেয়েছেন। কেউ এখানে

নামতে সাহস করেনা। বহুদিনের পুরাতন কয়েকটি শিমুল ও অন্যান্য গাছ নিয়ে বনজঙ্গলে ঘেরা শ্মশান। শ্মশানের উত্তর দিকে বর্তমানে ধান জমি। পূর্বে ধানজমির অংশে যে পতিত জায়গা ছিল সেখানে মেলা বসত।

বুমকেশ্বরীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস হল, যাদের হাত, পা বা শরীরের কোন অংশ কেটে যায়, তারা দেবীর কাছে প্রার্থনা জানালে তাদের সে প্রার্থনা পূরণ হয়। তবে আরোগ্য কামীদের একটি আচার পালন করতে হয়। আচারটি হ'ল—আরোগ্য লাভের পর ঐ ব্যক্তিকে বাড়ী থেকে মাথায় করে মাটি বহন করে মন্দিরের সামনে রাখতে হয়। এতেই নাকি দেবী সন্তুষ্ট হন। তবে কি পরিমাণ মাটি আনতে হবে, সে সম্পর্কে কোন কিছু নির্দিষ্ট নেই। প্রচলিত বিশ্বাস হ'ল—প্রতি অমাবস্যায় মন্দির সংলগ্ন ভূমিতে অন্ততঃ পক্ষে একটি মৃতদেহ সৎকারের জন্য আসবেই। এখানকার শ্মশান ভূমিতে সৎকারের জন্য বহু দূরস্থান থেকেও মৃতদেহ আসে। যেমন রানীগঞ্জ, মুঙ্গের, পাটনা ইত্যাদি স্থান থেকেও মৃতদেহ আনীত হয়। শ্মশানের চারদিকে অনেকগুলি বেদী, এগুলি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সৎকারের পর নির্মিত হয়েছে। স্থানীয় বিশ্বাস অনুযায়ী মন্দিরে দেবীর কাছে খুব প্রাচীন দুটি সাপ আছে। মন্দিরের নিকটবর্তী গ্রামটির নাম খরবোনা। মন্দির থেকে দূরত্ব পাঁচ কিলোমিটারের মত। রামপুরহাট থানার পশ্চিমে এই গ্রাম। আর এই গ্রামটির উত্তরেই 'বুমকোতলা' নামে ডাঙ্গায় দেবীর অধিষ্ঠান। মন্দির সংলগ্ন ঝিলের পাশ দিয়ে যে কন্দার প্রবাহিত, তার জল কোনদিনও শুকায় না, এমন কি গ্রীষ্মকালেও না। অনেকে বুমকেশ্বরীর মেলাকে ব্রহ্ম দৈত্যের মেলা বলে থাকেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দেবীকে কোন বৌদ্ধ দেবী বলে অনুমান করেছেন।

বাবা কুদড়োবুড়ো

জেলা বীরভূম, থানা রাজনগর, গ্রাম ভবানীপুর (নামোপাড়া)। চন্দ্রপুর বাস স্ট্যাণ্ড থেকে পাঁচমাইল দূরে খোলা জায়গায় কিছুটা ঘরের চালের আড়ালে বাবা কুদড়ো বুড়োর দেবস্থানটি অবস্থিত। দেবস্থানে শুধু কুদড়োবুড়োই অধিষ্ঠিত নন, তাঁর সঙ্গে আছেন বাবা গোসাই, বাবা মোহন গিড়ি এবং বাবালাল গিড়ি। অর্থাৎ সর্বমোট চারজন দেবতার আসন পাতা এখানে। প্রতিটি আসন সিঁদুর মাখান। আসনের পাশে রাখা আছে সিঁদুর মাখান লোহার চিমটে একটি,

একটি ত্রিশূল, একটি বাবুই কড়া (অর্থাৎ চাবুক) দেখতে বিনুনি করা বাঁশের লাঠি একটি, একটি বলিদেবার কাঠের খুঁটি। এ সবই সিঁদুর মাখানো। দেবস্থানটি উত্তরমুখী।

প্রতি মঙ্গলবার দেবস্থানে স্নান করে শুদ্ধভাবে ফুল ও মিষ্টান্ন সহযোগে পূজা করা হয়। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ সাড়ম্বরে দেবীর পূজা হয়। প্রধানতঃ গ্রামের বাগদীদের চাঁদায় এই পূজা হয়ে থাকে। অবশ্য অন্য সম্প্রদায় ভুক্ত মানুষও ইচ্ছা করলে পূজায় উপচার পাঠাতে পারেন। পূজার উপচারের মধ্যে থাকে বিভিন্ন ফল, চিঁড়ে, আতপ চাল দুধ ইত্যাদি। ঘটে দেবার জন্য লাগে একখানি কাপড়। পূজায় পাঁঠা বলি দেবার রীতিও আছে। উপবাস করে এই পূজায় অংশগ্রহণ করতে হয়। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামে থেকে বহু মানুষ এই পূজা দেখতে উপস্থিত হন। দেবতা খুব জাগ্রত বলে বিশ্বাস। অনেকেরই মনস্কামনা তিনি পূরণ করেন। কোন ব্যক্তি যদি শারীরিক দিক দিয়ে অসুস্থ হন, তবে তিনি তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়ে একটি নতুন মাটির কাঁচা সরায় একটি তামার পয়সা অথবা একটি হরতুকী রেখে দেবতাকে প্রণাম করে রেখে দিয়ে যান। পুরোহিত যিনি, তিনি পরের দিন সকালে ঐ সরায় যদি কোন শিকড় জাতীয় দ্রব্য দেখতে পান তবে সেটি সরা সমেত তুলে নিয়ে রুগীকে দেন। রুগীও নাকি সত্য সত্যই এর ফলে আরোগ্য লাভ করে।

প্রচলিত বিশ্বাস, পূজাটি ১৫০।২০০ বছরের প্রাচীন। পূজা আরম্ভ হয় বেলা ১০ টায় এবং চলে বিকাল চারটা পর্যন্ত। পূজার সময় পুরোহিতের ভর হয়। এক হাতে লাঠি আর এক হাতে চাবুক নাচাতে নাচাতে ভর হয়। চাবুকের সাহায্যে তিনি হাতে আঘাত করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। বর্তমান পুরোহিত হলেন শ্রীপটল পণ্ডিত। তার আগের পুরোহিত ছিলেন রংলাল পণ্ডিত।

কুমড়োবুড়ী

বীরভূম জেলার রাজনগর থানার অন্তর্গত লাউজোর বাস স্ট্যাণ্ড থেকে দুই কিলোমিটার দূরে কুণ্ডিরা গ্রামে কুমড়োবুড়ীর দেবস্থান। দেবস্থানটি গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। বর্তমানে দেবস্থানে পৌরোহিত্য করেন অনিল কুমার সরকার। পূজার যাবতীয় ব্যয় বহন করেন গ্রামের উপর পাড়ার জনসাধারণ।

কুমড়োবুড়ীর পূজা হয় একদিন। দিনটি হল ১লা মাঘ। পূজার সময় হল বেলা এগারটা থেকে বারোটা। পূজার উপকরণ হ'ল ফল, মিষ্টি, দুধ ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ দ্বারাই দেবীর পূজা হয়। পূজার প্রচলন দীর্ঘ দিনের। আনুমানিক ১০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন এই পূজা। কুমড়োবুড়ীর নামানুসারেই গ্রামটির নাম হয়েছে কুণ্ডিরা।

বহু প্রাচীন এক কুসুম গাছের নীচে দেবীর শিলা মূর্তি অবস্থিত। এখান থেকে কয়েকহাত মাত্র দূরে একটি গাছের গোড়ায় 'বাগড়াই' দেবের শিলামূর্ত্তি আসীন। উন্মুক্ত স্থানে দেবস্থানটি দশ কাঠা পরিমিত জায়গা নিয়ে অবস্থিত। কুমড়োবুড়ীর নামে এক বিঘা পরিমিত জমি আছে। গ্রামটিতে বৈষ্ণব, গোপ, তন্তুবায় ও ব্রাহ্মণের বাস। লোকমুখে প্রচলিত, পূর্বে এই গ্রামে চুরি, ডাকাতি, অগ্নিভয় ইত্যাদি নিবারণের জন্যই দেবীর পূজা হয়ে এসেছে। আরও বলা হয় যে কেউ যদি চুরি, ডাকাতি ইত্যাদির মত অপকর্মে লিপ্ত থাকে, তাহলে তাকে অন্ধত্ব প্রাপ্ত হতে হবে। জায়গাটি খুবই মনোরম। মাত্র দুই কিলোমিটার দূরেই শোভা পাচ্ছে পাহাড়, আর বনজঙ্গলে ঘেরা বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ডুমকা জেলা।

মেদিনীপুর

বাজার বুড়ী

মেদিনীপুর জেলার শীতলার প্রাধান্য চোখে পড়ার মত। কাঁথি, নন্দীগ্রাম, তমলুক, ঘাটাল ইত্যাদি অঞ্চলে এই প্রাধান্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঘাটাল শহরের মধ্যস্থলে আলামগঞ্জ গ্রামে এক শীতলা দেবী আছেন, ইনি পরিচিতা 'বাজার বুড়ী' নামে। বাজারে সন্নিকট স্থানে অবস্থিতির জন্যই এঁর এরূপ নামকরণ।

মূর্ত্তিটির উচ্চতা প্রায় তিন ফিটের মত। অষ্টধাতু নির্মিত মূর্ত্তি বলে রঙের কোন বালাই নেই, তবে দেখতে পেতলের মতন লাগে। মূর্ত্তির পরনে লাল রঙের বেনারসী শাড়ী ও ব্লাউজ। দেবীর দু'পাশে দুটি দেবদেবীর মূর্ত্তি

বিদ্যমান। এ'দুটিও অষ্টধাতু নির্মিত। দেবীর দক্ষিণে বাবা পঞ্চানন্দ এবং বামদিকে 'মা মনসা'। দেবীর সামনের দিকের দু'পাশে অষ্টধাতু নির্মিত ডাকিনী-যোগিনী। পাকা বেদীর ওপর কাঠের বিশেষ কারুকার্য খচিত সিংহাসনে অষ্টধাতু নির্মিত গর্দভের ওপর বাজার বুড়ী কলসী কাঁখে দণ্ডায়মানা।

দেবী দ্বিভুজা অপর হাতে ফুলমালা। বাবা পঞ্চানন্দের পরনে গরদের ধুতি, গলায় উড়ুনি। ইনিও সিংহাসনে সমাসীন। পঞ্চানন্দের বাম হাতে কাপড়ের কোঁচা, আর দক্ষিণ হাত বরাভয় দানে রত। মনসা মূর্তিটি সম্পূর্ণ অষ্টধাতু নির্মিত সাপের ওপর উপবিষ্টা। এঁর পরিধানেও বেনারসী এবং ব্লাউজ। দেবীর বাম হাতে সাপ, আর দক্ষিণ হাত অভয় দানে রত। অভয়দানকারী হাতটিতে রয়েছে ফুল। ডাকিনী-যোগিনীদ্বয়ের বাম হাতে রয়েছে একটি করে কাটা হাত, আর ডান হাতে একটি করে খড়গ। এ দু'টি মূর্তিও সম্পূর্ণ অষ্টধাতু নির্মিত। অস্ত্রসহ কাঠের সিংহাসনের নীচে অধিষ্ঠিত আছেন বিষ্ণুশিলা এবং প্রস্তর নির্মিত ষষ্ঠীদেবী।

বহু আগে পিতলের কলসীর ওপর পাথরের তৈরী মূর্তি বসিয়ে প্রত্যহ পূজার্চনা করা হ'ত। ১৩০৪ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ এখন থেকে ৮৬ বৎসর আগে অষ্টধাতু নির্মিত মূর্তিগুলি এবং সিংহাসন ইত্যাদি প্রস্তুত হয় এবং পূর্বোক্তভাবে অধিষ্ঠিতা হন। আলামগঞ্জ গ্রামের জনৈকা দুর্গারানী দাসী কর্তৃক মূর্তিগুলি প্রদত্ত হয়। দেবীর বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয় আনুমানিক ১৫০ বছর পূর্বে। এই মন্দিরে ১লা বৈশাখ এবং অক্ষয়তৃতীয়ার দিন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা দেবীর সামনে তাঁদের নূতন খাতা মহরৎ করান। এই উপলক্ষে প্রচুর জনসমাগম ঘটে।

দেবীর একটি রথ আছে। রথটি লোহার তৈরী। এর ওজন হবে আনুমানিক ৩০ কুইন্টাল। রথটি দশ হাত উচ্চতা বিশিষ্ট ; দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৮ ফিট করে। রথটির পাঁচটি চূড়া। পাঁচটি চূড়ার জন্য আছে পাঁচটি কলসী এবং চক্র। দেবীর বাৎসরিক পূজা হয় বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার। এই পূজা হয় খুব আড়ম্বরের সঙ্গে। তাছাড়া নিত্য পূজারও প্রচলন আছে। বার্ষিক পূজার সময় মন্দির বিশেষ ভাবে সজ্জিত হয়। এই সময়ে দিনের বেলা পূজায় ছাগ বলি হয়। আর রাত্রিবেলা রূপার নিকেল করা, পেতলের সিংহাসনে দেবীর প্রসাদী ফুল এবং রৌপ্য নির্মিত পাদুকা ইত্যাদি নিয়ে সহর পরিক্রমণ করা হয়। পূজায় বেশ অর্থ ব্যয় হয়। পূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসে এবং বহু ভক্ত সমাগম হয়। আষাঢ় মাসেও রথের সময় মেলা বসে এবং প্রচুর লোক সমাগম হয়। দেবীর

মন্দিরে জিতাষ্টমী তিথিতে পূজা হয়—জীমূত বাহনের।

দুর্গাপূজার সময় পূজার ক'দিন দেবীর ঘটেই দেবীর উদ্দেশে পূজা করা হয়। এই মন্দিরেই কার্তিক মাসে আলাদাভাবে মাটির সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্তি নির্মাণ করে পূজা করা হয়। দেবীর রাস উৎসবও পালিত হয়। তাছাড়া নবান্ন, দোল এসবও অনুষ্ঠিত হয়। দোলের পূর্বদিন চাঁচড় হয়। এই উপলক্ষে একদিকে দেবীর বিশেষ পূজার মত দেবীকে সিংহাসনে করে সহর পরিক্রমণ করান হয়।

ভীমপূজা

মেদিনীপুর জেলায় এক বিশেষ লোক দেবতা পূজিত হন—এঁর নাম ভীম। মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা হ'ল ভীম পূজার প্রধান কেন্দ্র। তা ছাড়াও মেদিনীপুরের অন্যান্য অঞ্চলেও যেমন ঝাড়গ্রাম, তমলুক এবং অন্যান্য মহকুমায়ও এই পূজা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের যে একাদশী তা পরিচিত 'ভীম একাদশী' বা 'ভৈম একাদশী' নামে। এই দিনেই ভীম পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা অনুষ্ঠিত হয় রাত্রি-বেলা। রাত্রিতেই ঘট নিরঞ্জন হয়। জলে মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয় না। মূর্তির রঙ হয় সাধারণতঃ লালচে হলুদ, তা ছাড়া লালচে খয়েরী বা অন্যান্য রঙেরও হয়ে থাকে। প্রতি বছর বা কয়েক বছর অন্তর মূর্তির রঙ পরিবর্তিত হয়। মহাভারতে বর্ণিত মধ্যম পাণ্ডবের অনুসরণেই মূর্তিটি নির্মিত হয়। উচ্চতায় মূর্তিটি হয় ১২ ফিটের মত। মূর্তিটি হয় সুঠাম ও স্বাস্থ্যবান। দেহের অনুপাতে মাথা হয় কিছু বড়। কাপড় হাঁটু পর্যন্ত পরিহিত। কোমরে থাকে গামছার মত উড়নি। তাছাড়া কানে থাকে দুল, হাতে বালা। দক্ষিণ হাতে থাকে গদা। গদার রঙ হয় সাধারণতঃ মেরুন বা লাল রঙের। মূর্তির থাকে চওড়া কাল গোঁফ, মাথায় কোঁকড়ান চুল, পায়ে জুতো। এছাড়াও ভীমের অন্যান্য যে সব মূর্তি নির্মিত হতে দেখা যায়, তা হ'ল ভীম কর্তৃক দুর্যোধনের উরুভঙ্গ, দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করে রক্তপান, জরাসন্ধ বধের মত ভীমের বীরত্ব ব্যঞ্জক মূর্তি।

ভীম পূজার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল যে ব্যক্তিগতভাবে কেউ এই পূজার আয়োজন করে না। শীতলা, বাবা ঠাকুর বা রক্ষাকালীর মত ভীম পূজা সার্বজনীন। ভীম পূজার উল্লেখযোগ্য উপচার হিসাবে লাগে সিদ্ধ ও পক্ক

রাঙালু। তাছাড়া অন্যান্য ফলমূল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি ত লাগেই। এখন প্রশ্ন হ'ল ভীম পূজার উদ্দেশ্য কি? পূজার মূল উদ্দেশ্য হ'ল ভীমের মত শক্তির অধিকারী হওয়া। তাছাড়াও ভীমকে কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি রূপেও দেখা হয়ে থাকে। এই সূত্রে তিনি ক্ষেত্ররক্ষক, বাঞ্ছিত বর্ষণের দেবতা। প্রসঙ্গত ভীম সম্পর্কিত কিংবদন্তী এবং বিশ্বাসের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টির জলে ভিজে ভীমই প্রথম মর্ত্যালোকে কৃষিকার্য শুরু করেছিলেন আর এই দিনটি ছিল মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী। এই দিনটির স্মরণেই ভীম একাদশী পালিত হয়ে আসছে।

রামেশ্বরের বহুখ্যাত 'শিবায়নে' দেখা যায় দারিদ্র্য থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় পার্বতীর পরামর্শানুযায়ী শিব স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের নিকট থেকে প্রাপ্ত কৃষি ভূমিতে কৃষিকার্যে যখন রত হলেন, তখন এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহায়ক ছিলেন ভীম। স্থানীয় বিশ্বাস, ভীমই মেদিনীপুরে প্রথম কৃষি কার্যের প্রবক্তা।

ভীমকে যে শক্তির দেবতা রূপে কল্পনা করা হয়, সেই প্রসঙ্গেও রয়েছে কিংবদন্তীমূলক কাহিনী। এই রকম একটি কাহিনী হ'ল শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে নির্জলা উপবাস করে ভীম একাদশী করে তারপর দুর্যোধনকে বধ করতে সমর্থ হন। যে একাদশী করেছিলেন ভীম, তাই হ'ল ভীম একাদশী।

ভীমের মাতৃভক্তি, শক্তিমত্তা এবং সেই সঙ্গে কৃষির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে একটি অনবদ্য কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। কাহিনীটি হ'ল এইরকম—

পাণ্ডব জননী কুন্তী একবার একাদশী ব্রত পালনে সমর্থ হচ্ছিলেন না, কারণ মাঘ মাসে পুষ্করিণীর জল এত ঠাণ্ডা হয়েছিল যে তিনি সেই ঠাণ্ডাজলে স্নান করতে পারছিলেন না। এই সংবাদ অবগত হয়ে ভীম পাশের ক্ষেত থেকে উঠে এসে লাঙলের ফলা গরম করে পুষ্করিণীর জলে ডুবিয়ে দেন। এর ফলে পুষ্করিণীর জল উষ্ণ হয়ে ওঠে। আর সেই জলে স্নানের ব্যাপারে কুন্তীর কোন রকম অসুবিধা হল না। আর এই থেকেই কুন্তীর আদেশে এবং বিষ্ণুর নির্দেশে ঐ একাদশী ভীম একাদশী নামে পরিচিতি লাভ করে। কাহিনীটিতে মাতাকে শৈত্যের হাত থেকে রক্ষার ব্যাপারে ভীমের সক্রিয় ভূমিকা তার মাতৃভক্তিকে সূচিত করে। সেই সঙ্গে ভীম যে কৃষির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত তা তার হাতের লাঙল এবং পাশের ক্ষেত থেকে উঠে আসার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। সর্বোপরি একটি লাঙলের গরম ফলার মাধ্যমে একটি পুষ্করিণীর জলকে গরম করে তোলার মাধ্যমে ভীমের শৌর্যও প্রতিপন্ন হয়।

সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেই ভীম পূজা করে থাকেন। কখনও কখনও কোন কোন জায়গায় আবার এর ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। মূলতঃ ভীম পূজার উপাসক হলেন বাগদী, ক্ষেতমজুর এবং ভূমিহীন মুনিষ ; পূজার দিন সকল প্রকার প্রাত্যহিক কাজকর্মের অনুষ্ঠান বন্ধ থাকে। এসবের মধ্যে আছে হলকর্ষণ, ঢেঁকি চালনা, কাপড়কাচা ইত্যাদি। পরিশেষে মেদিনীপুরে ভীম পূজার আধিক্যের কারণানু-সন্ধান প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে এই অঞ্চলের নানা স্থানে ভীম সম্পর্কিত কিংবদন্তীর সবিশেষ ঘনিষ্ঠতার কথা। এ সবের মধ্যে রয়েছে বগড়ি কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী একারিয়া গ্রাম যা পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসকালের একচক্রারূপে অভি-হিত হয়ে থাকে। তাছাড়া একারিয়ার নিকটবর্তী 'ভিকনগর' গ্রামে পাণ্ডবেরা নাকি ভিক্ষা করতেন, গড়বেতা সংলগ্ন গনগনির ডাঙা ভীম ও বকরাক্ষসের যুদ্ধক্ষেত্র বলে বলা হয়ে থাকে। খড়্গপুরের নিকটবর্তী ইন্দা গ্রামস্থিত খড়্গেশ্বর মন্দির সংলগ্ন প্রান্তরটি যা নাকি 'হিড়িম্বা ডাঙা' নামে পরিচিত, এখানে ভীমের সঙ্গে হিড়িম্বার প্রথমে যুদ্ধ, পরে বিবাহও সম্পন্ন হয়েছিল বলে কথিত হয়ে থাকে।

সয়লা

আধুনিক জীবনযাত্রার প্রভাবে একদিকে যখন মানুষের জীবন থেকে অবকাশ বিলুপ্ত প্রায়, অস্তিত্ব রক্ষার কঠিন সংগ্রামে গ্রামের মানুষ ক্লান্ত, তেমনি অপর দিকে নতুন নতুন আনন্দোপকরণের সহজলভ্যতার ফলে অনেক লোক-উৎসব বিলীন হয়ে গেলেও বিভিন্ন জেলায় এখনও আমরা কিছু কিছু উৎসবের সন্ধান পাই। এমনই একটি উৎসব হ'ল 'সয়লা'। এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় হাওড়ার পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে, মেদিনীপুরের হাওড়া সংলগ্ন সীমান্তবর্তী এলাকায় এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণার কোন কোন অঞ্চলে। সংক্ষেপে বলা যায় রূপনারায়ণ নিম্ন ভাগীরথী ও নিম্ন দামোদরের অববাহিকা অঞ্চলেই এই উৎসবটির আয়োজন চোখে পড়ার মত।

এক কথায় আমরা 'সয়লা' উৎসবকে অভিহিত করতে পারি 'মিতালি' উৎসব নামে। 'সয়লা' শব্দটি এসেছে সম্ভবত 'সহেলা' শব্দটি থেকে ; যার অর্থ হ'ল সখা। কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক মত প্রকাশ করেছেন যে 'সয়লা' শব্দটি সম্ভবত 'সহখেটন' থেকে এসেছে। আবার কারো মতে, 'সখীকারিকা' থেকে এসেছে 'সহী আলিআ' শব্দ এবং তার থেকে এসেছে 'সহীলি' শব্দটি।

হিন্দীতে এ'টিই হয়েছে 'সহেলি'।

বহু প্রাচীনকাল থেকেই মনসা পূজার সঙ্গে এই উৎসবটির নিবিড় যোগ। তবে একটা কথা, সহেলা উৎসবের জন্য মনসা পূজা একান্তভাবে আবশ্যক, কিন্তু তাই বলে মনসাপূজা হলেই 'সয়েলা উৎসব' অনুষ্ঠিত হবে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সয়েলার জন্য যে মনসা পূজার আয়োজন করা হয়, তা পাঁজি নির্দিষ্ট দিন দেখে নয়। যে কোনও শনি বা মঙ্গলবারেই মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হতে পারে। সয়েলা উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মনসা পূজায় পৌরোহিত্য করার জন্য কোন ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, ওঝা বা গুণিনই এক্ষেত্রে পৌরোহিত্য করে থাকে।

মনসা পূজা সহ 'সয়লা উৎসব' অনুষ্ঠিত হয় গ্রামের প্রান্তে কোন এক প্রশস্ত স্থানে। গ্রামের বহু মানুষ এই উৎসবে যোগদান করে, ফলে প্রশস্ত স্থানের প্রয়োজন হয় সারাটা দুপুর মূলতঃ মনসা পূজাতেই অতিবাহিত হয়। দেবীর যখন পূজা চলে তখন পাচালীকারেরা সইয়ের গান করেন। সই বলতে এক্ষেত্রে মনসা মঙ্গলে উল্লিখিত মনসা এবং ধন্বন্তরি ওঝার স্ত্রীকে বোঝান হচ্ছে। মনসা ধন্বন্তরি ওঝাকে মারবার জন্য পরিচারিকা নেতোর পরামর্শক্রমে ধন্বন্তরি ওঝার স্ত্রীর কাছে গিয়েছিল সইয়ের ছলনায়। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, মনসা এবং ওঝার স্ত্রীর মধ্যে একটা সখিত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যা নাকি লৌকিক মানসে আদর্শ বলে প্রতিভাত হয়। কারো কারো মতে এই ধারণা থেকেই সম্ভবতঃ সয়লা বা বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের উৎসবের সূচনা।

মনসা পূজার জন্য পুকুরঘাট থেকে যে জল সংগ্রহ করে ঘরে আনা হয়, সেই জল সংগ্রহ অনুষ্ঠানটিও একটি আকর্ষণীয় পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় শুরু হয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিয়ে সমবেত গুণিনদের মধ্যে চাপান এবং কাটান। অনেকটা কবির লড়াইয়ের অনুরূপ। তবে এক্ষেত্রে চাপান উতোরের বিষয়বস্তু স্বভাবতঃই মনসাদেবীর বিবিধ বৃত্তান্ত। ছড়ার মাধ্যমেই এই চাপান-উতোর চলে। এইবার আসা যাক মূল উৎসবের প্রসঙ্গে।

সয়লা উৎসবে উপস্থিত হয় যারা তাদের উদ্দেশ্য একান্তভাবেই ঐহিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত, কোন পারমার্থিক লাভের আশায় তাঁরা এই উৎসবের আয়োজন করেনা। উদ্দেশ্য হ'ল সখ্য স্থাপন। সমবেত নারী পুরুষের প্রত্যেক-কেই অন্য একজনের সঙ্গে আমরণ সখ্য সূত্রে আবদ্ধ হতে হবে। বলাবাহুল্য পূর্ব থেকেই এজন্য প্রায় সকলেই নিজনিজ মনোমত বন্ধু বা বান্ধবীর নির্বাচন

সেরে রাখে। সাধারণত পুরুষে পুরুষে যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, তার নাম হ'ল 'স্যাঙাত পাতান'; অপরপক্ষে মেয়েতে মেয়েতে যে বন্ধুত্ব পাতান হয়, তা পরিচিত 'সই পাতান' নামে।

সখ্য স্থাপনের জন্য প্রয়োজন হয় দু'জনের দু'খানি সোলার মালা উৎসব প্রাঙ্গণ থেকেই স্বল্প মূল্যে এই মাল্য সংগৃহীত হয়। কোনরূপ মন্ত্রোচ্চারণের পরিবর্তে পরস্পরের সঙ্গে মালা দুখানি কেবল বিনিময় করে নিতে হয় এবং মুখে মনসাদেবীর নামে অঙ্গীকার করতে হয় নিজেদের সম্পর্ককে চিরকাল অটুট রাখবে বলে। ব্যাস, তাহলেই সারা জীবনের মত সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। স্যাঙাত বা সই পাতান হয়ে গেলে উভয়ে আর পূর্বের নামে পরস্পরের কাছে পরিচিত হবেনা। আসলে তখন প্রকৃত নাম উচ্চারণ করাই অবিধেয় হয়ে পড়ে। একজন একাধিক স্যাঙাত বা সই পাতাতে পারে। এতে কোন বাধা নেই। সয়লা উৎসবকে কেন্দ্র করে এইভাবে দুজনের মধ্যে যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, ক্রমে তা পারিবারিক ক্ষেত্রেও সঞ্চারিত হয়। লোকউৎসব আমাদের সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করার ব্যাপারে যে কি ভূমিকা নিতে পারে সয়লা উৎসব তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নদীয়া

খেদাই ঠাকুর

নদীয়া জেলার চাকদহ থানার অন্তর্গত গ্রামে প্রতি বছর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে পূজিত হন যিনি, তিনি হলেন খেদাই ঠাকুর। কারো কারো মতে ইনি নাকি সর্প দেবতা, কারো মনে ইনি আসলে ক্ষেত্রপাল। আবার কেউ কেউ ফণিভূষণ মহাদেবও বলে থাকেন। সে যাইহোক, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে এই খেদাই ঠাকুরের পূজা দেবার জন্য খেদাইতলায় অসংখ্য আবাল-বৃদ্ধ বনিতাকে অর্ঘ্য উপহার নিয়ে যেতে দেখা যায়।

খেদাই ঠাকুবেব মূর্তিটি হ'ল আসলে পিতলের শিব। শিবের বামজানুতে মনসা উপবিষ্টা। একটি প্রাচীন নিমগাছের গোড়ায় মূর্তিটির অবস্থান। বলা হয় যে আনুমানিক ২৭০ বছব পুর্বে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রের সময় এই মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন মুর্শিদকুলিখাঁর আমল। মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাবুডাঙ্গায নিমগাছের তলায়। দুলে বা বাগদী পাড়ায় বরিশাল জেলার সলোকা গ্রামের রামসুন্দব বন্দ্যোপাধ্যায এব পূজা করতেন। সবাই রামসুন্দবকে ডাকত 'পাগল' বলে। 'খেদন বাগদী' বলে এ অঞ্চলে একজন অত্যন্ত দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক ছিল ' সে বামসুন্দব বা পাগলা ঠাকুরকে ঘৃণা করতো। একবার খেদনকে সাপে কামড়ায়। তখন তাকে আনা হয় এই পাগলা ঠাকুবের কাছে। খেদন সুস্থ হযে ওঠে এবং পাগলা ঠাকুবেব একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে ওঠে। সেই ঠাকুবেব মাহাত্ম্য প্রচাব কবতে শুরু কবে। আর এইভাবেই শুরু হয় শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ব্যাপক আকাবে খেদাই ঠাকুবেব পূজা। শ্রাবণ সংক্রান্তির দিনই নিমগাছের তলায় মেলা বসে এবং বহু দুব-দূবান্ত থেকে ভক্তেবা এসে থাকেন।

খেদাই ঠাকুরেব মাহাত্ম্য নিয়ে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত। যেমন কুপার সাহেব নাকি এই ঠাকুরেব একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, কারণ এখানে পূজা দিয়ে নাকি তাব বোবা মেয়ে কথা ফিরে পেযেছিল।

১৯৫০ সাল থেকে পূর্ববাংলার (অধুনা বাংলাদেশ) বহু লোক এখানে আসতে শুরু কবেন এবং বাবলা বন কেটে বসতি স্থাপন শুরু কবেন। সে সময়ে এই অঞ্চলে বিষাক্ত সাপের উপদ্রব। বহু মানুষ বিষাক্ত সাপের কামড়ে মৃত্যু বরণ কবেন। বিশেষতঃ সলোকার ঝিল ছিল বিষধর সাপের জন্য কুখ্যাত। উদ্বাস্তরা সর্প দংশন থেকে রেহাই পাবার জন্যে খেদাইতলায় পূজা দিতে শুরু করে। এইভাবে খেদাইতলার নাম দূর দেশেও ছড়িয়ে পড়ে।

খেদাই ঠাকুরের পূজারীরা বংশানুক্রমিক ভাবেই এই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। প্রথম থেকে এ পর্যন্ত পুবোহিতদের তালিকাটি উদ্ধার করে দেওযা গেল—

রামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোক বন্দ্যোপাধ্যায় (কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

জঙ্গলী পীরের মেলা

নদীয়া জেলার অন্তর্গত করিমপুর থানার একটি গ্রামের নাম থানাপাড়া। গ্রামের নাম থানাপাড়া হলেও বর্তমানে গ্রামে কোন থানা বা চৌকী নেই। নবাবী আমলে অবশ্য এখানে নাকি একটি থানা ছিল, আর সেই স্মৃতিই বহন করছে বর্তমান নামটি।

প্রায় আড়াইশ বছর পূর্বে এক মরমী সাধক এই গ্রামের এক প্রান্তে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি অশ্বত্থ গাছের তলায় বসে আপন মনে সাধনা করতেন। অল্পদিনের মধ্যেই কিন্তু এই মুসলমান সাধক দুরারোগ্য নানা ব্যাধির নিরাময়ক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। স্বভাবতঃই বহু মানুষের উপস্থিতি ঘটতে থাকে এঁর কাছে। ক্রমে ইনি পীর বলে পরিচিত হন। সাধকের প্রকৃত নাম বা অন্যান্য পরিচয় অজ্ঞাত থাকায় ইনি পরিচিতি অর্জন করেন 'জঙ্গলী পীর' নামে। জঙ্গলে অবস্থানের জন্যই এরূপ পরিচিতি লাভ ঘটে।

জঙ্গলী পীরের অলৌকিক ক্ষমতা নিয়ে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত। অপরাপর পীরের মত ইনিও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন বলে চিহ্নিত। তাই দীর্ঘকালধরে জঙ্গলী পীরের মাজারে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলে আসেন, মানত করেন সিন্নি, দেন পোড়া মাটির ঘোড়া আর জ্বেলে দেওয়া হয় প্রদীপ।

প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তিতে পীরের মাজারে জঙ্গলী পীরের উরস অনুষ্ঠিত হয় আর এই উপলক্ষ্যে বসে বিশাল মেলা। মেলাতে কেবল নদীয়া জেলার করিমপুর থানার মানুষেরাই আসেন না, আসেন তেহট্ট, কালীগঞ্জ, চাপড়া, নাকাশিপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলের লোকজন। এমনকি মুর্শিদাবাদ জেলা থেকেও অনেকে এই মেলায় আসেন। উরসে ফকিরেরা আসেন এবং মেলা যেন রূপান্তরিত হয় ফকিরের মেলায়। রাতে বসে ফকিরি গানের আসর। আসরটি বসে উদার উন্মুক্ত নীল আকাশের নীচে। এই উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল অসাম্প্রদায়িক পংক্তি ভোজন।

জঙ্গলী-পীর বাতের অসুখ সারাবার ব্যাপারে ছিলেন ধন্বন্তরী। এখনও তাঁর শিষ্য পরম্পরায় খাদেমরা বাতের রোগীদের দেন জলপড়া, তাবিজ, কবজ, মাদুলী।

পীরের শিষ্য পরম্পরায় যে খাদেম এখানে আছেন, তিনিই অন্যান্য অসংখ্য ভক্ত প্রাণ মানুষের সহায়তায় মেলা ও উৎসব পরিচালনা করে থাকেন।

জঙ্গলী পীরের মেলা চলে টানা সাত দিন ধরে। এই মেলার ইতিহাস প্রায় ১০০ বছরের। মেলার প্রধান আকর্ষণ হ'ল ভুট্টার খই। এত ভুট্টার খই অন্যত্র বিক্রয় হতে দেখা যায় না। খই বেচাকেনার মেলা বলেও তাই একে বলা যায়।

বর্ধমান

ভাঁজো

পশ্চিমবঙ্গের এক পরিচিত লোকদেবী হলেন ভাঁজো। বিশেষত বর্ধমান ও বীরভূমে এই লোকদেবীর জনপ্রিয়তা অনেকখানি। অজয় নদীর দুই তীরবর্তী অঞ্চলেই মূলতঃ ভাঁজোর অধিষ্ঠান। ভাদ্র মাসের যে ঘেঁটু ষষ্ঠী তাতেই ভাঁজোর বোধন সম্পন্ন হয়। এই দিন ভাঁজো পূজানুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারিণীরা শুচি বস্ত্রে নতুন সরায় বা তালের খোলায় বালি ও মাটি দিয়ে তাতে বিউলি, কলাই, সরষে শনের বীজ, পোস্তদানা, ধান ইত্যাদি যোগে 'শোষ' পাতেন। সরাতে কোথাও দুর্গামণ্ডপের মাটি অথবা ইঁদতলার মাটি দেওয়ার রীতি। 'শোষ'শব্দটি এসেছে সম্ভবতঃ শস্য' শব্দটি থেকে। যে বাড়ীতে ভাঁজো গান হয়, সেই বাড়ীর একটি কক্ষে সরাগুলিতে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় জল ছিটিয়ে তারপর ঢেকে রাখা হয়। এই পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে যা নাকি ইন্দ্র বা ইন্দ দ্বাদশী নামে পরিচিত, রাত্রিবেলায় অনুষ্ঠিত হয় ভাঁজো গান। এই গানে অংশগ্রহণ করে থাকে বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা, গানের সঙ্গে চলে নৃত্য আর বাজনা ত থাকেই। অংশগ্রহণ কারীদের মধ্যে বিবাহিতা এমন কি বিধবা রমণীরাও থাকেন। এই অনুষ্ঠানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ। একমাত্র যারা বাদ্য যন্ত্র বাজায় তারাই কেবল পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারে। বাদ্যযন্ত্র বলতে মূলতঃ ঢোল এবং

কাঁসি। তবে কোন কোন স্থানে সেই সঙ্গে সানাই বাজতেও দেখা যায়। মোটামুটিভাবে আটদিনের দিনই মূল উৎসবের সূচনা। এইদিন মেয়েরা সারাদিন উপবাসী থাকে, সন্ধ্যার সময় নিকটস্থ জলাশয় থেকে জল ভরতে যায়, সঙ্গে বাজে ঢোল ও কাঁসি। বাড়ী ফিরে হয় পূজা।

ভাঁজো মূর্তিটি কি সে সম্পর্কে মত পার্থক্য আছে। কোথাও মূর্তি বলতে অপ্সরী সহ ইন্দ্র মূর্তি। আবার কোথাও কোথাও শুধু এক নারী মূর্তিকে ভাঁজো বলা হয়। আবার 'ভাদু' মূর্তিও কোথাও কোথাও দেখতে পাওয়া যায়। যে যাইহোক, এই মূর্তি সন্ধ্যাবেলায় পুরোহিত পূজা করে যান। পূজার উপচার বলতে শালুক ফুলের মালা, গুড, বাতাসা চিঁড়ে ইত্যাদি। তাছাড়া ফল, সিঁদুর, আম্র-পল্লব এসবও থাকে। পুরুষদের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে গভীর রাত্রে অংশগ্রহণকারী মহিলারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। তাছাড়াও বহু মহিলা দর্শক ও শ্রোতারও উপস্থিতি ঘটে অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে গীত হয় প্রেমের গান, অপার্থিব প্রেমকথা, দেহতত্ত্ব, রাধা-কৃষ্ণের গান ইত্যাদি। এমনকি অনেক মজাদার ছড়াও আবৃত্তি হতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় ছড়া বেঁধে গাওয়া হয়। সারারাত ধরে এইভাবে নাচগান চলে। নিম্নবর্ণের সমাজের মেয়েরা এই সময় মদ্য পানও করে। বীরভূমে ভাঁজো পূজায় হাঁস, শশা এবং আখ বলি দেওয়া হয়। ভোরবেলায় পুকুরে 'শোষ' ভাসিয়ে সরার শস্যগুলি নিয়ে এসে বাড়ীর এবং ঘরের চালে গুঁজে দেওয়ার রীতি। গান গাইতে গাইতেই শোষ ভাসান হয়। এইদিন রাত্রে যে চন্দ্রোদয় হয়, তাকে বলা হয় নষ্ট চন্দ্র। এইদিন রাত্রে ছেলেরা ডাব, শশা, লেবু ইত্যাদি চুরি করে অন্যের বাগান থেকে। গৃহকর্তারা তাই রাত জেগে পাহারা দেন। অবশ্য চুরি ধরা পড়লেও কিছু হয় না।

একটি ভাঁজো গান উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত হ'ল—

ভাঁজুই লো সুন্দরী,
মাটি লো সরা,
কাল ভাঁজুর বিয়ে দেবো
গেঁথে দেবো বেল ফুলের মালা।
তোমার বাড়ী আমার বাড়ী
আট পাঁচিলে ঘেরা

হাত বাড়িয়ে পান দিলে
দেখলে দেওর ছোঁড়া।
গিয়েছিলাম জেমো কান্দী
দেখে এলাম রথ,
যেমন তোমার নাকের শোভা হে,
তেমন গড়িয়ে দেব নথ।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ভাঁজো অনুষ্ঠানে অনেক মজাদার ছড়া বলা হয়। এই রকম কয়েকটি ছড়া হ'ল—

আমার বাড়ী বর্দ্ধমান
তোমার বাড়ী থানা
রাস্তা বাঁধিয়ে দোব
বধূ করবে আনাগোনা।

* *

বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গেলাম
বসতে দিলে পিঁড়ে
পিঁড়ের ভেতর খোঁচা ছিল
কাপড় গেল ছিঁড়ে

* *

তেলের ভাঁড়ে তেল নাইকো
কপালে মারে ঘা
গোপার ছেলে হয়েছে
কাঠ বিড়ালীর ছা।

যে সরায় ভাঁজো পাতা হয়, তাতে জল দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, যাতে জল দেওয়ার কারণে সরার শস্যবীজ নষ্ট না হয়ে যায়। অনেকে বলেন ভাঁজো আসলে ইন্দ্র পূজারই লৌকিক সংস্করণ। ভাঁজো যে মূলতঃ কৃষির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাই লোক-বিশ্বাস ভাঁজো উপলক্ষ্যে পাতা সরা-গুলিতে চারা গাছগুলি যদি ভালভাবে বাড়ে তাহলে ফসল ভাল হয়।

ভাদুই চারা ভাল হলে ফসল যে হয় ভাল
ভাদুই মাঝে লুকিয়ে থাকে নতুন দিনের আলো।

ভাঁজোয় কুমারী মেয়েদের অংশগ্রহণের আধিক্য চোখে পড়ার মত। একটি গানে কুমারী মেয়েরা তাদের অবিবাহিত অবস্থার জন্য ইন্দ্ররাজাকে দায়ী করে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছে—

ইন্দ্র রাজা ইন্দ্র রাজা কিসের গরব কর
আইবুড়ো মেয়েদের বিয়ে দিতে নারো।

অপর একটি গানে আইবুড়ো মেয়েদের কি কি নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে হয় তার কথা বলা হয়েছে—

ঢোল বাজে ডুডুং ডুং কাঁসি কাই নানা
আইবুড়ো মেয়েদের কিসে কিসে মানা।
রাঙা পান খেতে মানা, মানা জোরে হাসি
কদম তলায় যেতে মানা শুনে কালার বাঁশি।

কুমারী মেয়ের চিরন্তন আশা—আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ভাঁজো পূজাকে এক করে আর একটি গানে বলা হয়েছে—

যারা ভাঁজ নাচ করে তারা সুখী হয়
ভাঁজ যারা নাচে তারা রাঙা বর পায়
বর পুতে সুখী তারা দুধে ভাত খায়।

ময়ূরপঙ্খী গানের উৎসব

বর্ধমান জেলার নানা স্থানেই এক বৈচিত্র্যপূর্ণ লোক উৎসব অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এই উৎসবটি হ'ল 'ময়ূরপঙ্খী গানে'র উৎসব। উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় মূলতঃ পৌষ সংক্রান্তি অথবা মকর সংক্রান্তির দিন। আবার কোন কোন অঞ্চলে মকর সংক্রান্তি ব্যতিরেকে বিশেষ কোন দেবতার পূজা বা শিবের গাজন উপলক্ষ্যেও ময়ূরপঙ্খী গানের লড়াই আয়োজিত হতে দেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ রায়না থানার অন্তর্গত মারুগ্রামে অনুষ্ঠিত ময়ূরপঙ্খী গানের লড়াইয়ের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে নৃসিংহ চতুর্দশীতে নারেশ্বরের গাজন উপলক্ষে এই লড়াই আয়োজিত হয়। ময়ূরপঙ্খী গানের জন্য যে সব অঞ্চলের প্রসিদ্ধি, সেগুলি হ'ল দামোদর নদের দক্ষিণ তীরবর্তী পলেসপুর, কামালপুর, মূলকাটি, বাঁধগাছা, মাছ-

খাস্তা, নতু, সাদিপুর ইত্যাদি। তাছাড়া দামোদর তীরবর্তী সদরঘাট থেকে শুরু করে নিম্ন ও দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের রায়না, জামালপুর, খণ্ডঘোষ ইত্যাদি অঞ্চলও উল্লেখযোগ্য।

মূলতঃ অন্ত্যজ হিন্দুদের মধ্যেই ময়ূরপঙ্খী গান সীমাবদ্ধ বলা যেতে পারে। এইবার উৎসবের প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। সাধারণতঃ নদীর চড়াতেই এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম থেকে অংশগ্রহণকারীরা এসে জমায়েত হয়। যদিও ময়ূরপঙ্খী বলতে সচরাচর আমরা বিশেষ এক শ্রেণীর নৌকাকে বুঝি, কিন্তু আলোচ্য উৎসবে নৌকার পরিবর্তে গরুর গাড়ীকে ময়ূরপঙ্খী সজ্জিত করা হয়ে থাকে। এখন দেখা যাক, কিভাবে তা করা হয়ে থাকে।

গরুর গাড়ীর ওপর বাঁশের বেঁকারি দিয়ে প্রথমে ময়ূরের একটি কাঠামো তৈরী করা হয়। তারপর খড় দিয়ে তৈরী করা হয় ময়ূরের মুখ এবং লেজ। এরপর কাপড় ও রঙীন কাগজ দিয়ে সাজান হয় সমগ্র কাঠামোটিকে। মনে রাখতে হবে যে এইভাবে প্রস্তুত ময়ূরটিকে পৃথক ভাবে গরুর গাড়ির ওপর স্থাপন করা হয়, আর এ ব্যাপারে সাহায্য নেওয়া হয় বাঁশের খুঁটির। ময়ূরপঙ্খী গানের গায়ক এবং বাদকেরা ময়ূরের মাঝখানে অথবা আশে পাশে জায়গা নিয়ে থাকে। অবশ্য বাদক বলতে অন্য কোন বাদ্যযন্ত্রের যন্ত্রী নয়, কেবল ঢোল এবং কাঁসি হলেই চলে এক্ষেত্রে।

ময়ূরপঙ্খী গানের উৎসবে অন্ততঃ দুটি দলের প্রয়োজন। কারণ এক গাড়ীর ময়ূরপঙ্খী দলের ভূমিকা হয় কৃষ্ণের, আর দ্বিতীয় গাড়ীর ময়ূরপঙ্খী দলের ভূমিকা হয় শ্রীরাধার। এর পর দু'টি গাড়ীর দু'টি দলে চলে চাপান—উতোর। গানের সঙ্গে সঙ্গে চলে অংশগ্রহণকারীদের অঙ্গ সঞ্চালন। আর সব মিলিয়ে বড় উপভোগ্য হয়ে ওঠে সমগ্র অনুষ্ঠানটি।

ময়ূরপঙ্খী গানের শুরু দেব বন্দনা দিয়ে। বন্দনার পরই শুরু হয় চাপান—উতোরের পালা। আর একটি কথা প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার। তা হ'ল এই সব গানের বেশ কিছু আগে থেকেই যেমন প্রস্তুত করা হয়ে থাকে, তেমনি তাৎক্ষণিক ভাবে রচিত সঙ্গীতের সংখ্যাও নেহাৎ কম থাকে না। ময়ূরপঙ্খী গানের উৎসবে শ্রোতা হিসাবে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের উপস্থিতিই লক্ষ্য করার মত।

কার্তিক লড়াই

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার 'কার্তিক লড়াই' একটি পরিচিত 'লোক উৎসব'। কার্তিক লড়াই অনুষ্ঠিত হয়—কার্তিক পূজা উপলক্ষে। অর্থাৎ কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে কার্তিক লড়াই অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এই উৎসবে যোগদান করে অসংখ্য মানুষ। এই উৎসব উপলক্ষে সারা কাটোয়া শহর যেন আনন্দে মেতে ওঠে।

কার্তিক পূজা উপলক্ষে বহু ঠাকুরকে অবলম্বন করে বিরাটাকৃতির সব 'থাকা' হয়। প্রায় প্রতিটি 'থাকা'তেই একটি ঠাকুরকে করা হয় 'রাজা কার্তিক'। অথবা ফুটফুটে সুন্দর একটি শিশু কার্তিককে করা হয় 'রাণী কাত্যায়নী'। আর এর ঠিক নীচে থাকে বহু ঠাকুর অবলম্বিত রামায়ণ মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণাদির ঘটনাবলী। এ সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল লক্ষ্মণের শক্তিশেল, রামচন্দ্রের হরধনু ভঙ্গ, যুদ্ধরত অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশদান, অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, ভীষ্মের শরশয্যা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, কর্ণ বধ, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ, তারকাসুর বধ ইত্যাদি। অতি সম্প্রতি পুতুলের মাধ্যমে কার্তিকের থাকাগুলিতে আধুনিক জীবনকে প্রতিফলিত করতে দেখা যাচ্ছে।

অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রা সহকারে কার্তিকের থাকাগুলি শহর পরিক্রমা করে। শহর পরিক্রমাকালে যখন একটি কার্তিক থাকা অপর একটি থাকার সম্মুখীন হয়, তখন প্রবল এক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

আমরা জানি কার্তিক দেব সেনাপতি। তাই কার্তিকের থাকাগুলির— অধিকাংশই বিভিন্ন অসুরের সঙ্গে কার্তিকের যুদ্ধ অবলম্বনে রচিত। এবং এই কার্তিকের যুদ্ধরত রূপটিকে প্রতিফলিত করার কারণেই সম্ভবতঃ কার্তিক লড়াই নামকরণের উৎপত্তি।

প্রাচীন কার্তিক থাকাগুলির অবস্থান বিশেষ করে ভাগীরথী তীরবর্তী কাটোয়ার বাজারে এবং গঙ্গা এলাকাতে লক্ষিত হয়। এর কারণ ভাগীরথী তীরবর্তী পতিতালয়গুলিই কার্তিক পূজার প্রাচীন উৎসস্থল। প্রাচীনকাল থেকেই 'কাটোয়া' একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র। তাছাড়া একটি বিখ্যাত বন্দর রূপেও পরিচিত ছিল। এই সব কারণে দেশের নানাস্থান থেকে বহু মানুষের সমাগম ঘটত এখানে। আর এইসব মানুষদের অনেকেই অবসর বিনোদনের

জন্য গিয়ে উঠত পতিতালয়গুলিতে। এইভাবে এতদঞ্চলের পতিতালয়গুলির প্রসার ঘটে। পতিতারা আয়োজন করত কার্তিক পূজার। উদ্দেশ্য কাত্যায়নীর মত সুন্দর সন্তানের জননী হওয়া। কিন্তু নানা কারণেই হতভাগিনীদের সুপ্ত বাসনা আর বাস্তবায়িত হত না। তবু লক্ষ্য করার যে আজও প্রায় অবলুপ্ত পতিতালয়গুলিতে 'শিশু কার্তিক পূজা' অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

কার্তিক পূজার আড়ম্বর সৃষ্টির মূলে ধনী ব্যবসায়ীদের ভূমিকা অনেকখানি। কারণ, এদের অনেকেই নিজ নিজ রক্ষিতাদের মনোরঞ্জনের জন্য কার্তিক পূজায় অজস্র অর্থ ব্যয় করতেন। এইভাবে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা থেকে এই পূজা আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে ওঠে।

হাওড়া

আব্দুল দীঘির স্নানযাত্রা

জননী মাত্রেই সন্তানের কল্যাণ কামনায় সদাই উদ্‌গ্রীব। সন্তানের স্বাস্থ্যের কারণে জননীরা কত রকমেরই না প্রয়াস চালিয়ে থাকেন। সন্তান যাতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় তা যতই কঠিন হোক, তবু স্নেহময়ী জননী আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত বাগনান থানার কাঁশরা গ্রামস্থিত আবদুল দীঘি সন্তানের সুস্বাস্থ্য লাভের ব্যাপারে অনেকখানি সহায়তা করে বলে বিশ্বাস প্রচলিত। দীঘিটি কয়েকশত বৎসরের প্রাচীন বলে কথিত। দীঘিটির পশ্চিম পাড়ে রয়েছে আব্দুল সাহেবের মাজার। শুক্ল পক্ষের রবিবার কিংবা যে কোনও রবিবার সকালে আব্দুল দীঘিতে গিয়ে স্নান করতে হয় প্রথমে। তারপর আব্দুল সাহেবের মাজারে গিয়ে মাজারস্থিত ফকিরের কাছে হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে কিছু ধুলো বালি আর কুঁজো থেকে দেওয়া একটু জল। বিশ্বাসী মানুষজন এই ধুলোবালি এবং জল বিনা দ্বিধায় খেয়ে নেয়। তারপর ফকিরের কাছে ঈপ্সিত

কামনা জানিয়ে দিতে হয় নগদ পয়সা অথবা কুমড়ো। কুমড়ো দেওয়ার কারণ হ'ল যাতে সন্তান কুমড়োর মত হয়।

সন্তানের স্বাস্থ্য কামনায় যারা উপস্থিত হয়, তারা বাড়ী থেকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় হলুদ মাখানো ছোট ছোট কাপড়ের টুকরো। এই টুকরোগুলিকে দীঘির পাড়ের যে কোন গাছের ডালে বেঁধে দিতে হয়। অন্যবিধ বাসনার কথা এখানে জানালেও, মুখ্যতঃ সন্তানের সুস্বাস্থ্যের জন্য বিশ্বাসী মানুষেরই উপস্থিতি ঘটে এখানে। অনেক সময় ঢোল-সানাই বাজিয়ে রীতিমত আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করতে দেখা যায় এখানে।

যদিও দীঘির নাম আব্দুল দীঘি, তবু শুধু দীঘির স্নানযাত্রায় কেবল মুসলমানকেই দেখা যায় না, দেখা যায় বহু হিন্দুকেও। এমন কি নবোঢ়া বধূকে পতিগৃহে যাবার প্রাক্কালে এখানে উপস্থিত হয়ে প্রণাম জানিয়ে যেতেও দেখা যায়।

আব্দুল নামীয় এক মুসলমান সাধককে কেন্দ্র করেই দীঘির নামকরণ হয়েছে। বর্তমানে এই সাধকের কোন উত্তরাধিকারী দীঘির উৎসব পরিচালনা করেন না। স্থানীয় ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিবা একত্রিত হয়ে কে স্নানযাত্রা পরিচালনা করবেন, তা স্থির করে দেন।

মাকড়চণ্ডী

হাওড়া-আমতা রোডের পাশেই অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদীর পশ্চিম পাড়ে প্রাচীন গৌড়ীয় রীতিতে নির্মিত যে বিশালাকৃতির মন্দিরটি দৃষ্টিগোচর হয়, সে'টিই হ'ল মাকড় চণ্ডীব মন্দির।

দেবীর মূর্তিটি আসলে সিঁদুর লেপিত একটি শিলাস্তম্ভ। এ'টি দৈর্ঘ্যে ৭·৭ মি. এবং প্রস্থে ৭·১ মি. এবং উচ্চতায় ১২·২ মি। মস্তকেই মুখাকৃতি—অলংকার শোভিত।

কিংবদন্তী অনুযায়ী পূর্বে প্রস্তর নির্মিত বিশালাকৃতির মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। পুজারী প্রতিদিন সেই মূর্তিকে সিঁদুর মণ্ডিত করতেন। বার্ধক্যহেতু তিনি সহজে দেবীর নাগাল পেতেন না এবং অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। তাই একদিন তিনি নাকি দেবীকে দৈর্ঘ্যে ছোট হবার জন্য প্রার্থনা নিবেদন করেন। এর ফলে দেবীমূর্তি হ্রস্ব রূপ ধারণ করে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকেন।

তখন ঐ পূজারী দেবীমূর্তি আঁকড়ে ধরেন। তিনি যতটুকু ধরতে পেরেছিলেন, ততটুকুই বর্তমান মূর্তি বলে বিশ্বাস প্রচলিত।

বলা হয় এই দেবীর প্রতিষ্ঠাতা হলেন শ্রীমন্ত সওদাগর। শ্রীমন্ত সওদাগর যখন যেখানে যাত্রা বিরতি করতেন, সেখানে এই চণ্ডীর পূজা না করে জলগ্রহণ করতেন না। ত্রিবেণী থেকে সরস্বতী নদী হয়ে 'বেতড়' বা বর্তমান বেতড় নামক স্থানে উপস্থিত হবার পথে তিনি পূর্ববাহিনী সরস্বতীনদীর যে স্থানে অবস্থান করেছিলেন তাই 'মা-পুর দহ' নামে পরিচিত। বলা হয় তখন এই স্থানটি হ্রদ আকারে বিদ্যমান ছিল। এখনও তার কিছু চিহ্ন বর্তমান। 'মা-পুর-দহ' নামটির ব্যুৎপত্তি নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন 'মাতৃপুর' শব্দটি থেকেই 'মাপুর' শব্দটির উৎপত্তি। আর সংস্কৃত 'হ্রদ' শব্দ রূপান্তরিত হয়েছে 'দহে'। কারো কারো মতে একটি মকর যা নাকি ছিল দেবীর বাহন, এই হ্রদেই অবস্থান করত। তার নামানুসারেই 'মাপুর দহ' নামটি এসে থাকতে পারে।

হিন্দু যুগের অবসানে এই স্থান নাকি বেতবনে পরিণত হয়। ক্রমে দেবীর প্রস্তর নির্মিত মন্দিরটি ধ্বংসে পরিণত হয়। পরে স্বপ্নাদেশে এক ব্রাহ্মণ ঐ স্থান পরিষ্কার করে দেবীর পূজার ব্যবস্থা করেন। মহিয়াড়ী গ্রামের জমিদার বংশের রামকান্ত কুণ্ডু দেবীর আদেশে বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন ১২২৮ বঙ্গাব্দে। রামকান্ত ছিলেন অন্ধ। মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা দিনের (৩২ আষাঢ) আগের দিন তিনি দুঃখের সঙ্গে দেবীকে জানান তিনি এমনই হতভাগ্য যে মন্দিরটি স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য সুখ থেকে বঞ্চিত। বলা হয় রামকান্ত ঐ দিনই ভোরবেলায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান।

মাকড়দহ গ্রামের এই চণ্ডীর পূজা চট্টোপাধ্যায় বংশীয়দের পারিবারিক। আদি পুরুষ ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এঁরই বংশধরদের নামে এখনও পূজায় সংকল্প করা হয়।

নিত্য দেব সেবার জন্য জমিদার কুণ্ডু চৌধুরী পরিবার নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন। বর্তমানে অবশ্য জমিদারী প্রথা বিলোপ হওয়ায় এই সাহায্যদান বন্ধ হয়ে গেছে। সেবায়েতরাই নিত্যপূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করেন। রথযাত্রা, মহাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, অন্নপূর্ণা পূজা, রক্ষাকালী পূজা, এগুলি এখনও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া পৌষ সংক্রান্তির মেলা এবং পঞ্চম দোলের উৎসব তো আছেই। ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমার পর পঞ্চমী তিথিতে

পঞ্চম দোল অনুষ্ঠিত হয়। মাকড়দহের মেলা যা পঞ্চম দোল উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তার সূচনা হয়েছিল ১২৫২ সালে। মেলার প্রধান আকর্ষণ বাজি পোড়ান। মেলাটি চলে পক্ষকাল ব্যাপী। দেবীর মন্দিরের পূর্বদিকের তিনটি জলাভূমিতে হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা ও কলকাতা থেকে আগত ব্যক্তিরা বাজি পোড়ান সারারাত্র ধরে।

বর্তমান মূল মন্দিরের সামনে নাটমন্দির, তারপরে প্রাঙ্গণ ও বলিদানের স্থান। মন্দিরের দক্ষিণে পাকশালা যা দোলযাত্রার সময় অন্নক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এরই সামনে শিবমন্দির। উত্তরে ভোগালয়। এখানে একটি পৃথক ঘর আছে সেখানে চৈত্র সংক্রান্তির দিন নীলাবতীর পূজা হয়। বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাস্ট বর্তমান মন্দিরটির সংস্কার সাধন করেছেন। দেবীর নিত্য পূজা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য 'চণ্ডী সেবায়েত সঙ্ঘ' নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে।

বেতাই চণ্ডী

হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলের বেতাইতলা নামক স্থানে অবস্থিত বেতাই চণ্ডীর মন্দিরটি। এক সময়ে বেতবন এই অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত ছিল, সেই কারণে বেতবন থেকে প্রাপ্ত চণ্ডীমূর্তি 'বেতাইচণ্ডী' নামে পরিচিতি অর্জন করেছেন। আনুমানিক পাঁচশত কিংবা ততোধিক বৎসরের প্রাচীন এই মন্দিরটি বহু কিংবদন্তীর নায়ক। কবিকঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গলে যে বেত্রকা চণ্ডীর উল্লেখ আছে তা এই বেতাই চণ্ডীই। বেতাইতলা স্থানটি আদিতে পরিচিত ছিল 'বেতড়' নামে। সরস্বতী নদীর স্রোত ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় বেতড় অঞ্চলটি বাণিজ্যের দিক দিয়ে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। পরিণামে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শিবপুরের বহুখ্যাত হালদার বাড়ী বেতাইচণ্ডীর মূর্তির যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও পূজার্চনায় দায়িত্ব পালন করে আসছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে বেতাই চণ্ডী হালদারদের বাড়ীতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। চণ্ডীর প্রাপ্তিস্থানে ছিল কেবল একটি বেদী। পূর্বে উৎসবের দিনে হালদার বাড়ী থেকে বেতাই চণ্ডীর মূর্তিটি বহন করে বেতাইতলায় নিয়ে আসা হত এবং পূজা শেষে

পুনরায় হালদাব বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। পরবর্তীকালে ১৯৩০ সালে দেবীর উদ্ভব স্থানের বেদীকে রূপান্তরিত করা হয় মন্দিরে এবং ১৯৩২ সালে স্থায়ীভাবে হালদার বাড়ী থেকে মূর্তিটি এনে মন্দিব মধ্যে স্থাপন করা হয়। হালদারদেব পদবী ছিল ঘোষাল। ইংরেজ আমলে মেটিয়া বুরুজে দেওয়ানী মামলার হাবিলদার নিযুক্ত হওয়ায় এরা হালদার নামে পরিচিতি অর্জন করেন।

বেতাই চণ্ডীর মূর্তি বলতে বেদীর ওপর একটি বড় প্রস্তর খণ্ড বসানো। প্রস্তর খণ্ডটি প্রকৃতিব নিয়মে অথবা অন্যবিধ কাবণে মুখ চোখের আকার প্রাপ্ত মূর্তির রূপ ধারণ করেছে। দর্শনার্থীরা মূর্তিটিকে সিংহমূর্তি বলে মনে করে থাকেন।

বেতাই চণ্ডীব পূজাব উপকরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মাছ। প্রত্যহ দেবীব উদ্দেশে যে পঞ্চব্যঞ্জন সহ ভোগ নিবেদন করা হয়, তাতে আবশ্যিক ভাবে মাছ থাকে। বেতাইচণ্ডীকে কেন্দ্র করে দু'টি বড় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এব একটি হল দুর্গাপূজা এবং অপরটি গাজন। দুর্গাপূজায় দেবী পক্ষের শুরু থেকেই এখানে বহু সন্ন্যাসীর সমাগম ঘটে। এখানকাব 'বিপত্তারিনী ব্রত'ও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। দেবী চণ্ডীমন্ত্রেই পূজিতা হন।

বেতাই চণ্ডী সম্পর্কিত কিংবদন্তীটির এইবাব উল্লেখ করা যেতে পারে। দেবীব মূর্তিটিব উদ্ভবকে কেন্দ্র করে যে জনপ্রিয় কিংবদন্তীটি প্রচলিত আছে তা হল বহুকাল আগে যখন সরস্বতী নদীর ধাবা এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'ত, সেই সময় একদিন স্থানীয় জমিদার বাড়ীতে কোনো এক উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। সরস্বতী নদী অতিক্রম করে নৌকা এসে ভিড়ল এপারে। নৌকায় ছিল উৎসব বাড়ীর প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এসবের মধ্যে ছিল ফলমূল মিষ্টান্ন ইত্যাদি। বাহকবা যখন এই সব জিনিস বাঁকে করে নদীতীর থেকে জমিদার বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন ঘন বেতবনের মধ্যেকাব বাস্তার এক স্থানে হঠাৎ একটি ছোট মেয়ে বাহকদের পেছনে পেছনে চলতে শুরু করে এবং ঝুড়ির মধ্যেকার একটি কলা দেওয়ার জন্য বারংবার অনুরোধ করে। কিন্তু বাহক বালিকাটির অনুরোধে কান দেয় না। অবশেষে জমিদার বাড়ীতে ঐসব ফলমূল খাওয়ার সময় দেখা যায় কেবলমাত্র ঐ কলাগুলির মধ্যে কোন শাঁস নেই, শুধু খোসাই বর্তমান। সেইদিনই রাত্রে জমিদার স্বপ্নে বালিকা দেবী চণ্ডীকে দর্শন করেন এবং দেবীর কাছে আদেশ পান যে বেতবনের নির্দিষ্ট

জায়গায় যেখানে তিনি আছেন, সেখান থেকে যেন তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করার পর ঘোষাল পরিবারের ওপর তাঁর তত্ত্বাবধানের সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। সেই থেকেই দেবী ঘোষাল, বর্তমানে হালদারদের দায়িত্বে রয়েছেন।

মুর্শিদাবাদ

ঠকঠকে উৎসব

ফাল্গুন মাসের শেষ তিন দিন মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত করিমপুর মহকুমায় একটি লোক-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, যার নাম 'ঠকঠকে'। এই উৎসবটি একান্ত-ভাবে বালক ও পুরনারীদের উৎসব। সন্ধ্যার কিছু আগে পুরনারী কতকগুলি মাটির পুতুল তৈরী করে সঙ্গে মাটির প্রদীপ নিয়ে গ্রামের ষষ্ঠীতলায় কোন একটি নির্দিষ্ট গাছের তলায় সেগুলিকে স্থাপন করে। প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে এরপর তারা গিয়ে সমবেত হয় গ্রামের প্রান্তে। এদিকে পল্লীর ছেলেরা কলার বাসনা, শুকনো পাতার আঁটির সঙ্গে কঞ্চি বেঁধে তাতে অগ্নি সংযোগ করে আর তা দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খেলা করে। সকলের হাতেই থাকে হাতের মাপের শুকনো সজনে বা পাল্‌তে মাদারের ছ'টি করে প্রজ্বলিত ঠকঠকে নামক কাঠ। এই কাঠ ঠুকেই ছেলেরা অগ্নি ক্রীড়ায় মত্ত হয়। আসলে এই উৎসবটির সঙ্গে যাদুক্রিয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান। গ্রামের মানুষ কলেরা বা ওলাওঠায় আক্রান্ত হয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু বরণ করত আগেকার দিনে। তাই এই যাদু-ক্রিয়ার সাহায্যে ঐ মারাত্মক রোগের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতেই উৎসবটির সূচনা।

উৎসব শেষে রমণীরা গৃহে ফেরার সময় ওলাবিবির ছড়া আবৃত্তি করে। ঐ ছড়াতে ওলাবিবিকে দেশ ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেবার জন্য সকরুণ প্রার্থনা জানানো হয়ে থাকে—

"আমাদের দেশের ওলাওঠা ভাটির দেশে সাজে
ভাই বাপকে ঘরে থুয়ে, লোহার শিকলি দুয়োরে দিয়ে,
আমরা যাব ওলাউঠির দেশে।"

এরপর গৃহে প্রবেশের সময় দু'টি করে দল বেঁধে প্রশ্নোত্তর ছলে এই ছড়া আবৃত্তি করতে শোনা যায়—

দুয়োরে কেন হাতা ?
গিন্নী বড় দাতা।
দুয়োরে কেন ঝাঁটি ?
সবাই লোহার কাঠি।

মা ডুমনী

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানার ন পুকুর গ্রামে ডুমনী তলা বা মা ডুমনীর আশ্রম। ন পুকুর গ্রামের উত্তর দিকে রয়েছে ডুমনীদহ বিল। মনে করা হয় যে এককালে ডুমনীদহ ছিল মূল গঙ্গার গর্ভ। গঙ্গার গতি পরিবর্তিত হবার কারণে দহের আকার দেখা দিয়েছে। মা ডুমনী হলেন চতুর্ভুজা প্রস্তরময়ী মূর্তি। দেবীর পূজার দায়িত্ব পালন করেন মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত সেবায়েতরা। দেবী তারা দেবীর ধ্যানে পূজিতা হন। প্রতি শনি এবং মঙ্গলবার ভক্ত সমাবেশ ঘটতে দেখা যায় এখানে। লোক বিশ্বাস ডুমনী দেবীর পূজার্চনা করলে মৃত-বৎসা জননী সন্তান লাভের অধিকারী হন।

মা ডুমনী সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তীটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। বহুকাল আগে যখন গঙ্গা এখান দিয়ে প্রবাহিত হ'ত, সেই সময় এক জমিদার তাঁর নবোঢ়া পত্নীসহ নৌকাযোগে এই জলপথে যাচ্ছিলেন। আকস্মিক দুর্যোগে জমিদারের নৌকাটি ডুমনী তলায় আটকা পড়ে। দুর্যোগ স্থায়ী হয় পাঁচ-সাতদিন যাবৎ। স্বভাবতঃই জমিদারের সঙ্গী সাথীরা এই ক'দিনের অনাহারে খুব কাতর হয়ে পড়ে। সকলে যখন ক্ষুধায় কাতর, তখন নবোঢ়া পত্নী তাঁকে কাঁচা বাঁশ এনে দিতে বললেন। তিনি জানালেন যে তাহলে তিনি ঐ বাঁশ প্রজ্বলিত করে রান্নার ব্যবস্থা করে দেবেন।

অনন্তর জমিদারের লোকজন কাঁচা বাঁশ কেটে এনে জমিদার গিন্নীকে দিল। তিনিও তাঁর কটিদেশ থেকে একটি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বের করে ঐ বাঁশ খুব পাতলা করে ছাড়িয়ে রান্নার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু নবোঢ়া পত্নীর এবংবিধ আচরণে জমিদার তাঁর প্রতি খুব সন্দিহান হয়ে উঠলেন। জমিদারের মনে হ'ল তাঁর পত্নী ডোম-কন্যা। নতুবা অত সহজে তাঁর পক্ষে বাঁশের চিলতে ছাড়ান সম্ভবপর হত না। আর যাইহোক জমিদার হয়ে ডোমকন্যাকে সহধর্মিনী হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি গভীর রাতে পত্নীকে বনমধ্যে একাকী ফেলে রেখে চলে গেলেন। এই অবস্থায় বধূটি দুঃখ-শোকে এবং সর্বোপরি অপমানে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়লেন। তাঁর দেহটি ক্রমে ক্রমে পাষাণে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এরপর স্থানীয় এক ডোমকন্যা রাত্রে স্বপ্নাদেশে পাষাণী দেবীর বৃত্তান্ত অবহিত হয়। এইভাবেই পাষাণে রূপান্তরিতা ডোমনী-বধূ ডোমনী মা নামে পূজিতা হতে থাকেন।

এই কাহিনীটিরই পরিবর্তিত রূপ হ'ল এই রকম।

এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের জন্য বনে উপস্থিত হলে সেখানে এক রূপবতী ডোমকন্যার সাক্ষাৎ পায় এবং যুবকটি কন্যার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। যুবকটি জ্বালানী না পেলে রূপবতী কন্যাটি তাকে কাঁচা বাঁশ কেটে আনতে বলে। কন্যাটি যুবকটির আনা কাঁচা বাঁশ নিজের কাটারি দিয়ে কেটে জ্বালানী প্রস্তুত করে দেয়। এরপর যুবকটি কন্যার প্রকৃত পরিচয় লাভ করে তাকে ঘৃণাপূর্বক ত্যাগ করে চলে যায়। এই কন্যাটিই পরিচিতি লাভ করেন ক্রমে মা ডুমনী রূপে। ডুমনী তলায় অনেক প্রাচীন বৌদ্ধমূর্তি এখনও দৃষ্ট হয়। তাই কেউ কেউ মনে করেন ডোমনী দেবী আসলে কোন বৌদ্ধ দেবী। ডোমনী গান এবং এই নামের মিশ্র লোকনাট্য মালদহ জেলার মানিকচক, রতুয়া ইত্যাদি অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। অবশ্য ডোমনী গানকে মূলতঃ খোট্টা ভাষাভাষীদের গান বলেই মনে করা হয়ে থাকে।

মা ডুমনী সম্পর্কিত কিংবদন্তীগুলি বিশ্লেষণ করলে হয়ত অন্যবিধ এক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। পরিবেশ এবং পাত্রপাত্রী বিচার করলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে জমিদার অথবা যুবকটি অন্ত্যজ শ্রেণীর এক যুবতীকে নিজের ভোগের শিকারে পরিণত করে প্রয়োজন মিটে গেলে তাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। দুর্বলের ওপর সবলের নিপীড়নের এক মর্মন্তুদ কাহিনী মনে হয় কিংবদন্তীটিতে লুক্কায়িত রয়েছে। নিপীড়িত যুবতীটি পরবর্তীকালে দেবী

রূপে স্থানীয় অঞ্চলে স্বীকৃতি লাভ করেন। এমনও হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিংবদন্তীটির নায়কই নিজের অপকর্মকে ধর্মের আচরণে আবৃত করেছে নিজেকে কলুষমুক্ত করতে।

মালদহ

জহরাকালী

মালদহ শহরের অনেকখানি দূরে মহানন্দা নদীর গা ধরে এগিয়ে গেলে বাঁশবন, বিশেষতঃ সুবিস্তৃত আম্রকাননের মধ্যে গোপালপুর গ্রামের সন্নিহিত গোবিন্দপুর মৌজায় জহরা চণ্ডীমাতার থান। সম্প্রতি জহরাচণ্ডীর পাকা মন্দির গৃহ নির্মিত হলেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত দেবীর কোন মন্দির ছিল না। মন্দিরে দেবীর কোন বিগ্রহ নেই। আছে একটি বড় মাটির ঢিবি, অবশ্য তা সিঁদুরে মাখান। এই ঢিবিটিকেই দেবী জ্ঞানে পূজা করা হয়। অবশ্য ঢিবির ওপর শোভা পাচ্ছে দেবী চামুণ্ডার মুখ অঙ্কিত একটি মুখোস।

জহরাকালী আসলে নাকি চতুর্ভূজা দুর্গা। মোটামুটি ভাবে দুর্গার ধ্যান পূজার সময় উচ্চারিত হলেও সম্পূর্ণ দুর্গার ধ্যান মন্ত্র হিসাবে পঠিত হয় না, কিছুটা পার্থক্য আছে।

কথিত আছে যে সেন রাজারা রাজধানী গৌড়কে পরিখা দ্বারা বেষ্টিত করেছিলেন। আর গৌড় নগরীকে রক্ষাকল্পে পরিখার চারদিকে চারটি দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই চারটি দেবী মূর্তির অন্যতম হলেন জহরাকালী। ইনি গড়ের উত্তর-পূর্বে অধিষ্ঠিতা এবং দক্ষিণ মুখী। অপরাপর দেবীরা হলেন যথাক্রমে পাতালচণ্ডী, গৌড়েশ্বরী ও দোরবাসিনী। এর মধ্যে দোরবাসিনীর অধিষ্ঠান বর্তমান বাংলাদেশে। অবশ্য পাতালচণ্ডী, গৌড়েশ্বরী কিংবা দোর-বাসিনীর কোন উল্লেখযোগ্য চিহ্নই আজ আর নেই। একমাত্র জহরাকালীর অস্তিত্বই এঁদের মধ্যে বিদ্যমান।

বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে মাটির ঢিবির মধ্যে জহরাকালীর আসল মূর্তি প্রোথিত। কালাপাহাড় যখন হিন্দুদের দেব দেবী ধ্বংসের কার্যে ব্যাপৃত,

তখন তাঁর হাত থেকে জহরাকালীকে রক্ষার জন্যই নাকি মাটির ঢিবি করে তার মধ্যে দেবীকে লুকিয়ে রাখা হয়। পরবর্তীকালে অবস্থা শান্ত হলে ঢিবির মধ্য থেকে দেবীমূর্তিকে বার করার চেষ্টা হলে স্বপ্নাদেশে দেবী মাটির ঢিবির মধ্যেই তাঁর অবস্থান করার ইচ্ছা জানান। সেই থেকেই দেবী একই অবস্থায় রয়েছেন।

গত প্রায় তিনশ বছর ধরে দেবীর পূজার দায়িত্বে রয়েছেন বিহারের ছাপড়া জেলা থেকে আগত তেওয়ারীরা। এঁরা কনৌজ ব্রাহ্মণ। প্রথমে যিনি দেবীর পূজার দায়িত্ব নেন, তাঁর নাম ছব্ব তেওয়ারী। এঁরই পৌত্র হীরা-রাম তেওয়ারী দেবীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন আনুমানিক ১২১৩ বঙ্গাব্দে। সিদ্ধিলাভ ঘটেছিল বৈশাখ মাসে। সেই থেকে বৈশাখের একেবারে শুরু থেকে শেষপর্যন্ত দেবীর বিশেষ পূজার্চনা হয়। এই সময়ে এখানে বিরাট মেলা বসে। বৈশাখের প্রথম থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত শনি ও মঙ্গলবারে যজ্ঞ হয়। এমনিতেও সারা বছর প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবারে দেবীর পূজা হয়। পূজায় কোন অন্নভোগ দেওয়া হয় না। আর সূর্যাস্তের আগেই দেবীর পূজা শেষ হয়। বছরের বিশেষ কয়েকদিন শনি বা মঙ্গলবার না পড়লেও দেবীর পূজা হয়। এই দিনগুলি হ'ল ১লা বৈশাখ, মহালয়া, দুর্গা-সপ্তমী, অষ্টমী ও মহানবমী, কালীপূজা ইত্যাদি।

এখন থেকে প্রায় দুশো বছর আগে মাটির ঢিবির ওপর চামুণ্ডার এক মুখোসকে দেবীর প্রতীক হিসাবে রাখার রেওয়াজ শুরু হয়েছে। বলা হয় স্থানীয় এক কুমোর দেবী কর্তৃক এই মুখোস তৈরীর নির্দেশ পান। সেই থেকে প্রতি বছর এই কুমোর পরিবার বংশানুক্রমিক ভাবে এই মুখোস তৈরী করে আসছেন। প্রতি বৎসর নতুন মুখোস স্থাপন করা হয়। বৈশাখের প্রথম যে শনি বা মঙ্গলবার সেইদিনই নতুন মুখোসটি স্থাপন করা হয়। নির্দিষ্ট দিনেই মুখোসটির রঙের কাজ শেষ করার রীতি। অর্থাৎ মুখোসটিকে যেদিন অভিষিক্ত করা হয়, তার আগে মুখোস তৈরী সম্পূর্ণ হয়ে গেলেও রঙ লাগানো হয় না। মুখোস স্থাপনের নির্দিষ্ট দিনে মুখোস নির্মাতা উপবাসী থেকে স্নান করে সূর্যোদয়ের পর রঙ লাগানোর কাজ শেষ করেন। এরপর কয়েক সহস্র ভক্ত শোভাযাত্রা সহকারে মুখোসটিকে কুমোরের বাড়ী থেকে দেবীর স্থানে নিয়ে আসেন।

প্রচলিত বিশ্বাস, দেবীর কাছে বাঘ এসে লেজ দিয়ে স্থানটি পরিষ্কার করে দেয় এবং দেবীর কাছে মানুষ ভক্ষণের বাসনা জানায়। কিন্তু দেবী সেই বাসনা

নাকচ করে কেবল ছাগল ইত্যাদি প্রাণী ভক্ষণ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করার পরামর্শ দেন। সেইজন্যেই এই অঞ্চলে নাকি ব্যাঘ্র কর্তৃক মানুষ হত্যার কোন নজির নেই। আগে কাছেই ছিল বন। সেই বন থেকে সহজেই বাঘ আসত।

নবাব হোসেন শার কোন কর্মচারী নাকি এসেছিলেন মাটির ঢিবির মধ্যে অধিষ্ঠিতা দেবীর মূর্তি ধ্বংস করতে। কিন্তু ধ্বংস করতে পারেন নি, উল্টে তাঁর নাকি খুব ক্ষতি হয়েছিল। তাই তিনি বলেছিলেন যে মাটির ঢিবির মধ্যে 'জহর' বা বিষ আছে। সেই থেকেই দেবী পরিচিত হয়ে আসছেন 'জহরাকালী' বলে। জহরাকালীর স্থান থেকে বাংলাদেশের অন্তর্গত রাজশাহীর দূরত্ব খুব কম। বাংলাদেশ থেকে এখনও বহু মুসলমান পূজার সামগ্রী নিয়ে জহরাকালীর পূজা দিতে আসেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই দেবীর পূজা দেন।

গোপালপুর গ্রামে প্রায় তিনশত গোঁসাই পরিবার ছিল। এদের কাজ ডাকাতি করা। এরা ডাকাতি করতে যাবার আগে নাকি দেবীর পূজা করে যেত। এবং সাফল্যের সঙ্গে ডাকাতি করে এসে ঘটা করে দেবীর পূজার আয়োজন করত। তাই জহরকালীকে অনেকে ডাকাতে কালীও বলে থাকেন। যে জায়গায় জহরকালীর অধিষ্ঠান, সেই জায়গাটি খুব নির্জন। আশেপাশে কোন লোকালয় নেই বললেই চলে। কালীর কাছে সন্ধ্যার পর আর কেউই থাকেনা।

এখানে পূজার সময় কখনই ঘট প্রতিষ্ঠা করা হয় না। ঢিবির একেবারে মাথার ওপর, আর তার পেছনের দিকে সংলগ্ন দু'টি কোণে মোট তিনটি গর্ত আছে। এই গর্ত তিনটি কখনই ভর্তি হয় না। একবার নাকি এক সেবাইত কৌতূহলী হয়ে গর্ত তিনটি মাটি দিয়ে ভর্তি করে দেন। কিন্তু পরে দেখা গেল ঐ গর্ত তিনটি আগের মতই রয়ে গেছে।

সবশেষে জহরকালীর সেবাইতদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ প্রয়োজন। প্রথমেই আমরা যে ছব্ব তেওয়ারীর কথা উল্লেখ করেছি, তাঁরই বংশধর হলেন এঁরা—হীরালাল, দেবীপ্রসাদ, চন্দ্রশেখর, ললিতমোহন তেওয়ারী ইত্যাদি।

২৪ পরগণা

বনবিবি ও দক্ষিণ রায়

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল যে আঠার ভাঁটির মালিক—বনবিবি কোন নির্দিষ্ট স্থানের দেবী নন। সুন্দরবনের প্রায় সমগ্র এলাকাতেই তাঁর পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সুন্দর বনের বর্তমান লোক সমাজগুলি গড়ে উঠেছে মাত্র ১০০-১৩০ বছরের মধ্যে! নিষ্ঠুর প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে মানুষ বসতি স্থাপন করেছে।

বর্তমান শতকের সূচনায় বন কেটে আবাদ করা বন্ধ হ'ল। কিন্তু আবাদ এলাকার চেয়ে জঙ্গল এলাকা অনেক বেশী। জঙ্গল কেটে কাঠ, মধু আহরণ, আর নদীগুলি থেকে চলে নিত্য মাছ সংগ্রহের কাজ।

সুন্দরবনে মায়ের মহালকে চলতি কথায় বলা হয় মাল্। তাই 'মালে'র সর্বত্রই মায়ের পূজা করা হয়। জঙ্গলের মধ্যে ও জঙ্গলের ধারে-পাশে সর্বত্রই হয় দেবীর পূজা। ফরেস্ট অফিসের সংলগ্ন কুঁড়ে ঘরে আছে মায়ের মূর্তি, সেখানে নিত্য মায়ের পূজা করা হয়। অনেক জায়গায় গাছের তল দেশেও বনবিবির থান আছে।

যে সমস্ত লোকেদের সঙ্গে জঙ্গলের যোগাযোগ প্রত্যক্ষ তারাই নিজেদের এলাকাতে দেবীর পূজা করে। সাধারণতঃ নদীর ধারে দেবীর পূজা হওয়ার বিধান, তবে খালের ধারেতেও পূজা অনুষ্ঠিত হয়। নদীয় ধারে গাছের তলায় একটা কুঁড়েঘর বেঁধে তাকেই দেবীর পূজার স্থান বলে সকলে মেনে নেয়।

সুন্দর বনের বাসন্তী, রায়চন্দ্র খালি, গোসাবা, সন্দেশখালি, সাহেব-খালি, সাত জেলিয়া, রাঙ্গাবেলিয়া, পাখীরালা, সাধুপুর, দয়াপুর ইত্যাদি প্রায় সব গ্রামেই দেবী পূজা হয়ে থাকে। বোগড়া (হেঁতাল), গেঁয়ো ইত্যাদি গাছের তলায় সাধারণতঃ দেবীর পূজা হতে দেখা যায়। নদীর ধারে এই সূত্রে গড়ে উঠেছে অনেক ছোট-বড় মন্দির।

বন বিবির পূজায় হাজত দেওয়ার রীতি। আবার মূর্তি গড়েও দেবীর পূজা করা হয়। মাটির ঢিবি করে জঙ্গলের মধ্যেও পূজা করা হয়। ঢিবির ওপরে ছোট ছোট স্তূপ করা হয় সাতটি। তারপরে দুধ, কলা ইত্যাদি দিয়ে

দেওয়া হয় ভোগ। এটাকেই বলে 'হাজত'। জঙ্গল করা মানুষরা এইভাবে হিন্দু দেবদেবী বা মুসলমান গাজীর পূজা করে থাকে সাধারণতঃ।

কোনো কোনো স্থানে রীতি হল পূজার সময় মুরগী উৎসর্গ করা। জঙ্গলে বা পাড়াতে এই রকম উৎসর্গীকৃত মুরগী ছাড়া থাকে, যারা অনায়াসে চরে বেড়ায়। কেউ তাদের ক্ষতি করে না। অনেক স্থলে আবার হাঁসও উৎসর্গ করা হয়।

যে কোন বন্য ফুল দিয়ে দেবীর পূজা করা হয়। পূজা হয় গরান গাছের পাতা দিয়েও। তবে পূজায় শাঁখা, সিঁদুর, দূর্বা ইত্যাদি একেবারেই নিষিদ্ধ। পূজাটা সাধারণতঃ রাত্রিবেলাতেই হয় এবং পূজা শেষ হতে প্রায় রাত্রি এগারটা বেজে যায়।

পূজায় যে সব উপকরণ লাগে সাধারণতঃ, তা হ'ল

আবীর (লাল+সাদা), পঞ্চ শস্য, ধূপ ও ধূনা, মালা ও ফুল, বরণ সজ্জ (ধুতি, লাটিম, আয়না, চিরুনী, লাল কড়ি ঘুনসী) ফল, মধু, চাল, দুধ, মিষ্টি ইত্যাদি দিয়ে তৈরী ক্ষীর, বট, ডাব (সশিষ) গামছা, চারটে তীরকাঠি ইত্যাদি।

একটি পুঁথি আছে 'বনবিবি জহুর নামা'—বলে। সেটিই ব্রত কথার মত পাঠ করা হয় পূজায়। পাঠ সমাপন হলে তবেই পূজা শেষ হয়। আবার কোন কোন স্থানে যাত্রা গানও অনুষ্ঠিত হয়। এইসব যাত্রা পালার বিষয় বনবিবি ও দুখের বৃত্তান্ত।

সাধারণতঃ যে কোন সময়েই বনবিবির পূজা হতে পারে। জীবিকার সন্ধানে কাঠ কাটতে বা মধু, মাছ সংগ্রহ করতে জঙ্গলে যাদেরই যেতে হয়, তারাই বনবিবির পূজা দেয়। তাই জেলে, কাঠুরে এদের মধ্যেই বনবিবির প্রচলনটা বেশী।

বছরে দু'বার সাধারণতঃ খুব ঘটা করে বনবিবির পূজা করা হয়—এই দুটি উপলক্ষ্য হল যথাক্রমে পৌষ সংক্রান্তি এবং মাঘী পূর্ণিমা, তাছাড়া অনেক হিন্দু ঘরে যেমন বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূজা হয়, তেমনি ঐ সমস্ত সম্প্রদায়ের ঘরে ঘরে শুক্রবার বনবিবির ঘরোয়াভাবে পূজা করা হয়। এর কারণ হল শুক্রবার জঙ্গলে প্রবেশ নিষিদ্ধ। বিশ্বাস, ঐদিন মা বনবিবি জঙ্গলে থাকেন না। ঐদিন তাঁর আদি বাসস্থান মক্কা—মদিনায় তিনি চলে যান। সেখানেও মুসলিম সমাজে বনবিবির পূজা করা হয়।

তাই বনবিবির পূজার দিন ক্ষণটি অত্যন্ত হিসাব সাপেক্ষ। জঙ্গলে যাবার আগে, জঙ্গলে গিয়ে এবং জঙ্গল থেকে ফিরে এসে দেবীর পূজা করা হয়। জঙ্গলে

যাবার সুনির্দিষ্ট সময় নেই। জেলে, কাঠুরিয়া সম্প্রদায় সব সময়ই যায়। মৌলেরা (মধু সংগ্রহকারী) যায় সাধারণত ফাল্গুন-চৈত্র মাসে। তাই অনেক জায়গায় বৈশাখ মাসে বনবিবির বাৎসরিক পূজা হতে দেখা যায়। আবার অগ্রহায়ণ মাসেও পূজা হয়ে থাকে।

বনবিবির মূর্তির বিবরণ হ'ল বনবিবি বাঘকে বাহন করে নিয়ে তার পৃষ্ঠে আসীনা। মায়ের দিকে তাঁর ভাই সাজঙ্গলি খাপড়া (গদা) হাতে দাঁড়িয়ে। মায়ের কোলে পরম ভক্ত দুখে। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে হাত জোড় করে কৃপা প্রার্থনা রত।

আবার অনেক মূর্তির মধ্যে বরকান গাজীকে মায়ের অনুগত হিসেবে দেখা যায়। দুখেকে দেখা যায় মায়ের সামনে হাত জোড় করে দণ্ডায়মান বা হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে উপবিষ্ট অবস্থায়। দুখে হল মায়ের বরপুত্র। সাজ-ঙ্গলি হল মা বনবিবির আপন মায়েব পেটের ভাই।

এরা যমজ ভাই বোন। দেবী এবং বাকী যারা দেবীর সঙ্গে ঠাঁই পেয়েছেন প্রত্যেকেরই দুটি করে হাত। সাধারণত মা বনবিবির চেহারায় অস্বাভাবিক কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয় না।

সুন্দরবনের হিংস্র প্রাণী, মানুষ খেকো রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে বশে আনার জন্য মায়ের সঙ্গে তারও পূজা করা হয়, যেহেতু বাঘ হল মায়ের বাহন।

বনবিবির পূজায় সকলের অবাধ অধিকার তা সে ব্রাহ্মণ বা অব্রাহ্মণ হোক না কেন। শুদ্ধাচারে উপবাসী থেকে পূজা করতে হয়। পূজা শেষ করে প্রসাদ খেয়ে তবে অন্য কিছু খেতে পারা যায়। পরিবারের মধ্যে কোন অশৌচ (শুভ অথবা অশুভ) হলে সেই পরিবারের আর কেউ পূজা করতে পারে না।

মা বনবিবি জঙ্গলের অধীশ্বরী। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান অথবা আদিবাসী নির্বিশেষে সকলেই মায়ের পূজা করতে পারে। জঙ্গলের সঙ্গে যাদেরই প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তারাই মা বনবিবিকে স্মরণ করে। বলা যেতে পারে যে জঙ্গল করা মানুষই তাঁর সেবক।

পূজা করা হয় পুঁথি পড়ে। বনবিবি পূজার একটা নির্দিষ্ট পুঁথি আছে। হিন্দু মেয়েরা যেমন পাঁচালি পড়ে, বনবিবির পূজাতেও তেমনি বনবিবির পাঁচালি পড়া হয়। যে কেউ পাঁচালী পড়তে পারে। তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের

ছোঁয়াচ আছে বলে অনেক স্থানে কোনো মুসলিমকে ডেকে এনে পুঁথি পড়ানো হয়।

সমাজে নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যেও এই পূজার ঋত্বিক হবার চল আছে। অনেক স্থানে ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে সম্পূর্ণ হিন্দু মতেও বনবিবির পূজা করান হয়। তবে মা বনবিবি সম্পূর্ণ লৌকিক দেবী বলে তাঁর পূজার কোন সুনির্দিষ্ট মন্ত্র নেই।

সুন্দরবনের লোকেরা বাংলা দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত এবং বিভিন্ন স্থান থেকে আগত। তাই এখানকার সংস্কৃতি হল বৈচিত্র্যময় এবং প্রকৃতিতে মিশ্র। বনবিবি পূজায় পুরোহিত নিয়োগের ক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার মত।

ব্যক্তিগত অথবা বারোয়ারী দু'ভাবেই দেবীর পূজা করা হয়। বনবিবির ভোগ যে কেউই দিতে পারে। এর কোন নির্দিষ্ট বিধান নেই।

বারোয়ারীভাবে চাল, ডাল, টাকা, পয়সা ইত্যাদি যোগাড করে দেবীর পূজা করা হয়।

পূজার উদ্যোক্তারা মুখ্যতঃ পুরুষ সম্প্রদায়। যদিও কোন পুরুষ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাড়ীতে বনবিবির পূজা করে থাকেন, তথাপি বলা চলে এই দেবী সমষ্টি দ্বারাই অধিকতর পূজিতা। লৌকিক দেবীর যা বৈশিষ্ট্য, এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে! সুন্দর বনের জঙ্গল হাসিল করা, আবাদ করা, কাঠ কাটা, মধু সংগ্রহ করা বা মাছ ধরা সবই একক প্রয়াসের পরিবর্তে সমষ্টিগত ব্যাপার। তাই প্রয়োজনের খাতিরে এই দেবী সমষ্টিগত পূজাই পেয়ে এসেছেন।

দক্ষিণ বঙ্গের সুন্দর বন অঞ্চলে দক্ষিণ রায় নামটির সঙ্গে সকলেই পরিচিত। এই দক্ষিণ রায় হলেন বাঘের দেবতা, একে তুষ্ট করার জন্য প্রাচীন লোক কবিরা রায় মঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। এই দক্ষিণ রায়ই ব্যাঘ্রের রূপ ধরে মানুষ ধরে নিয়ে যান বলে বিশ্বাস। অপরপক্ষে বনবিবি এবং তাঁর ভাই সাজঙ্গলি দক্ষিণ রায়ের মানুষ নিধনের হাত থেকে লোক সমাজকে রক্ষা করে থাকেন।

জঙ্গল করা লোকেরা দল বেঁধে জীবিকার সন্ধানে জঙ্গলে প্রবেশ করে সারা রাত্রি মায়ের নাম গান করে। বন মধ্যে আছে ডাকাতের ভয়, আছে বাঘের ভয়। তাছাড়াও অন্যান্য নানাবিধ অজানা ভয় ত আছেই। তাই সুন্দর-বনের মানুষের প্রয়োজনের মধ্যেই পূজা করার উদ্দেশ্য নিহিত আছে। এই প্রয়োজনের তাগিদেই কল্পিত হয়েছেন বনবিবি এবং দক্ষিণরায়।

এইবার বনবিবি দক্ষিণরায়কে নিয়ে প্রচলিত কাহিনীটির প্রসঙ্গে আসা যেতে পাবে।

এক ফকির ছিলেন, তাঁর নাম বেরাহিম। ফকিরের স্ত্রীর নাম ফুলবিবি, এই ফুলবিবি ছিলেন নিঃসন্তান। বেরাহিম তাই আর একটি বিয়ে করবেন বলে সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু বেরাহিমের সিদ্ধান্তের কথা শুনে ফুলবিবি কান্না শুরু করে দিলেন। শেষে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বেরাহিম বললেন যে, তিনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু ফুলবিবিই তাঁর স্ত্রী হিসেবে লাভ করবে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা। তিনি আরও বললেন যে সব সময়ই ফুলবিবির কথা মতো তিনি চলবেন। তার কোন বাসনা তিনি অপূর্ণ রাখবেন না। তখন ফুলবিবি এই বিয়েতে তাঁর মত দিলেন।

এদিকে বেরাহিম যে কন্যাকে বিবাহ করে ঘরে নিয়ে এলেন, তার নাম গুলাল বিবি। বৎসরান্তে গুলাল বিবি সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়লেন। সুযোগ বুঝে ফুলবিবি তার স্বামীকে বলে বসলেন যে গুলাল বিবিকে বনবাসে দিতে হবে। বেরাহিম প্রথমে তার প্রথমা স্ত্রীকে কতই বোঝালেন, কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। ফুলবিবির ঐ একই আব্দার। শেষে কী আর করেন বেরাহিম, তিনি যে ফুলবিবির কাছে কথা দিয়েছেন, অবশেষে নিজের দুঃখ নিজেই গোপন করে বেরাহিম তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী গুলাল বিবিকে বনবাস দিলেন। বাদাতে থাকাকালীন এই গুলাল বিবির গর্ভেই জন্ম হল যমজ দুটি সন্তানের। এদেরই একজন হলেন বনবিবি (বোন) অপর জন সাজঙ্গলি, দুজনে ভাই-বোন।

বাদাবন বা সুন্দর বনের অধিকর্তা হলেন দণ্ডবক্ষ মুনি, তিনি আবার শিবের অংশ বিশেষ, তাঁর স্ত্রীর নাম নারায়ণী। তিনিও দুর্গার অংশ বিশেষ। এঁদের পুত্রের নাম দক্ষিণ রায়। দণ্ডবক্ষ মুনি নারায়ণী ও দক্ষিণ রায়কে রেখে মারা গেলেন। এই দক্ষিণ রায় হিন্দু দেবতা, তিনি নরবলি চান, তিনি ব্রাহ্মণ, বাঘের ছাল গায়ে চাপিয়ে মাঝে মাঝে প্রয়োজন পড়লে মানুষ ধরতে বের হন। কালীর ভক্ত তিনি। বাদার সমস্ত মধু এবং কাঠের অধিকারী।

আল্লা মেহের বানের দয়াতে বেরাহিমের দ্বিতীয়া পত্নী গুলাল বিবি বনের মধ্যে নির্বিঘ্নে বাস করতে লাগলেন। তাদের কোন বিপদ দেখা গেল না, বনবিবি ও সাজঙ্গলি দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। সারা বাদাতে তারা দুটি ভাই-বোনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

বেশ কিছুদিন বাদে বেরাহিম ফকির নিজের ভুল বুঝতে পেরে বাদাবনে

উপস্থিত হলেন গুলাল বিবিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু তারা গেলেন না। পরন্তু বনবিবি ও সাজঙ্গলি জানালেন যে তাঁরা আল্লার দোয়া পেয়েছেন। এই বাদাবনেই তারা বাস করবেন এবং এখানে থেকে তারা মানুষের দুঃখ দূর করবেন।

এদিকে দক্ষিণ রায়ের অত্যাচার দিনে দিনে বাড়তে লাগলো। কেউ তাকে প্রতিহত করতে পারে না। দিন দুনিয়ার মালিক খোদাতাল্লা তাই বনবিবি ও সাজঙ্গলিকে পাঠালেন দক্ষিণ রায়কে উচিত শিক্ষা দিতে। দক্ষিণ রায়ের মা নারায়ণীর সঙ্গে বনবিবির হল প্রচণ্ড যুদ্ধ। বনবিবি কিন্তু নারায়ণীর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না। অবশেষে আল্লার কৃপায় বনবিবি জয়লাভ করে আঠারো ভাটির মালিক হলেন। তারপরে মা বনবিবির শাসনে বন হয়ে উঠল শান্তির আধার।

ধনা মোনা দুই ভাই, জাতিতে তারা মুসলমান। ধনী ব্যক্তি তারা। এদের বাসস্থান বরুজহাটি (হাসনাবাদের নিকটবর্তী), ছোট নদী বরুজের তীরে এদের বিরাট বাড়ী। একদিন বন থেকে মধু সংগ্রহ করে আনার সংকল্প করল ধনা, মোনা বারণ করল। সে বললো যে তাদের যা টাকা-পয়সা আছে তাইই যথেষ্ট আর ধন ঐশ্বর্যে কাজ নেই। কিন্তু এ কথা শুনে ধনা বলল যে রাজার ধনের সমান সম্পত্তি থাকলেও তা বসে বসে খেলে নিঃশেষ হয়ে যায়। অতএব বাদাতে মধু মোম ইত্যাদি সংগ্রহ করতে যেতে হবে। মোনা আর কি করে, দাদার প্রস্তাবে তাকে সম্মতি দিতেই হলো।

ধনা-মোনা সপ্তডিঙ্গা সাজিয়ে, লোকজন জুটিয়ে বাণিজ্য করতে গেল। কিন্তু একজন লোক কম পড়ল। সেই গ্রামে থাকত 'দুখে' বলে একটি ছেলে, বছর দশ-বারো তার বয়স হবে। ছেলেটির বাবা নেই। সে গ্রামে রাখাল-গিরি করে। ধনা-মোনার সঙ্গে গ্রাম সম্পর্কে দুখে চাচা-ভাইপো। এই দুখেকে ধনা তার সঙ্গে নিয়ে যাবে বলে মনস্থ করল। তাই সে দুখের বাড়ী গেল এবং যাবার প্রস্তাব দিল। দুখে তো শুনে- লাফিয়ে উঠল আনন্দে এবং যাবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করল, কিন্তু দুখের মা দুখেকে ছাড়তে রাজি নন। তিনি বললেন যে বাদাতে অনেক বিপদ, তাছাড়া সেখানে রয়েছে বাঘের ভয়। দুখেই তার একমাত্র ছেলে। অতএব দুখেকে তিনি ধনার সঙ্গে বাদাতে যেতে দিতে রাজি নন।

শেষে প্রচুর টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে দুখের মাকে রাজি করিয়ে ধনা

দুখেকে নিয়ে চলল বাদাতে, দুখের মা চোখের জল মুছে বললেন যে বাদাতে মা বনবিবি আছেন। যদি কখনও দুখে বিপদে পড়ে তবে যেন তাকে স্মরণ করে, তাহলেই তার বিপদ কেটে যাবে। আর ধনাও দুখের মাকে কথা দিল যে সে সর্বদা দুখেকে আগলে রাখবে। মোহলে তার কোন বিপদই হবে না। দুখেকে নিয়ে ধনা মোহল করতে বাদাতে চলে গেল। দুখের মা বনবিবির পূজা করলেন।

ধনার সপ্তডিঙ্গা রায়মঙ্গল পার হয়ে হেড়েভাঙ্গা, ফলতলি প্রভৃতি অতিক্রম করে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল। এদিকে দক্ষিণ রায়ের চক্রান্তে বাদার সমস্ত মধু মোম অদৃশ্য হয়ে গেল। ধনার ওপর দক্ষিণ রায় অত্যন্ত চটে ছিলেন। কারণ ধনা দক্ষিণ রায়ের কোন পূজা না দিয়েই বাদাতে মোহল করতে প্রবেশ করেছে। গড় খালিতে গিয়ে ধনা তার সপ্তডিঙ্গা বাঁধল। দক্ষিণ রায় অন্তরাল থেকে সবইত দেখেছেন। তিনি গড় খালি অঞ্চলে অলৌকিক প্রভাবে গাছে গাছে প্রচুর মৌচাক সৃষ্টি করলেন। কিন্তু নরবলি না দিয়ে ধনা মধু নিয়ে যাবে এটাও তাঁর কোনমতেই কাম্য নয়।

ধনা-মোনা মহানন্দে চাক ভাঙতে লাগল। কিন্তু না, কোনমতে মধু সংগ্রহ করা যায় না। দক্ষিণ রায়ের মায়ায় সমস্ত মধু পড়ে যেতে লাগল। কিছুই সংগ্রহ করা গেল না। ধনা তখন বুঝল নিশ্চয়ই দেবতা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। সেই রাত্রে দক্ষিণ রায় ধনাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁর পরিচয় দিলেন। বললেন যে তাঁর পিতা হলেন দণ্ডবক্ষ মুনি। এ বনে মধু মোম কাঠ সবই তাঁর অধিকার-ভুক্ত। ধনা এখানে মোহল করতে এসেছে, কিন্তু তাঁর পূজা দেয়নি। দক্ষিণরায় তাকে নরবলিসহ পূজা দিতে আদেশ করলেন। জানালেন তবেই সে মোমমধু সব পাবে। তখন ধনা হায় হায় করতে লাগল। সে বলল যে সে মোম মধু চায় না। লোকজন নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে চায়। এই কথা শুনে দক্ষিণ রায় আরও রেগে গেলেন। বললেন যে তাঁর পূজা না দিয়ে চলে গেলে ধনার লোকজন সমস্ত কুমীরকে দিয়ে খাওয়াবেন। ধনা পড়ল মহাবিপদে। সে এর থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে লাগল। দক্ষিণ রায় বললেন যে দুখেকে তার কাছে বলি দিতে হবে। তাহলে ধনা প্রচুর মধু ও মোম পাবে, তার ফলে বড় লোক হতে পারবে। ধনা কাঁদতে লাগল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে দুখেকে দেবে বলে স্বীকার করল। মানে করতে বাধ্য হল।

তার পরের দিন ধনার লোকজন চারদিক ঘুরে সহজেই প্রচুর মোম এবং মধু

সংগ্রহ করল। এইবার বাড়ী ফেরার পালা। কিন্তু দুখেকে তো দক্ষিণ রায়কে দিয়ে যেতে হবে। ধনা দুখেকে রান্নার জন্য কাঠ আনতে বলল। দুখে প্রথমে রাজি না হলেও পরে কেঁদখালির জংগলে গেল একা কুড়ুল হাতে কাঠ আনতে। আর এদিকে ধনা-মোনার সপ্তডিঙ্গা দুখেকে কেঁদখালির জংগলে ফেলে বাড়ীর দিকে যাত্রা করল।

কাঠ কেটে এনে দুখে দেখল ধনা-মোনা কেউ নেই! এমনকি তাদের সপ্তডিঙ্গা পর্যন্ত উধাও। সকলে কেঁদখালির চরে দুখেকে বিসর্জন দিয়ে চলে গেছে। অসহায় দুখে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। এদিকে দক্ষিণ রায় বাঘের রূপ ধরে দুখেকে ধরতে এলো। বাঘকে দেখে দুখে 'কোথা মা বনবিবি রক্ষা কর' বলে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। মা বনবিবি তখন ভুর কুণ্ডুতে, ভক্ত দুখের আকুল ক্রন্দনে মায়ের আসন টলে উঠল। তিনি ভাই সাজঙ্গলিকে নিয়ে ছুটে এলেন দুখেকে রক্ষা করতে। অচেতন দুখেকে মা বনবিবি কোলে তুলে নিলেন, আর ভাই সাজঙ্গলিকে বললেন রাক্ষস দক্ষিণ রায়কে উচিত মত শিক্ষা দিতে যাতে সে আর কখনও নরবলি দিতে না পারে। সাজঙ্গলিতো প্রথমে এক প্রচণ্ড চড় কষালেন বাঘের গালে। তার পরে 'খাপড়া' হাতে তাড়া করলেন ব্যাঘ্ররূপ দক্ষিণরায়কে। বাঘতো প্রথমে চড় খেয়েই চোখে অন্ধকার দেখল তারপরে বুঝল এ লোক তার চেয়ে অধিকতর শক্তিধর। তাই সে ভয়ে ছুটে পালাল। সাজঙ্গলিও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি খাপড়া হাতে বন বাদাড় ভেঙে নদী ডিঙিয়ে বাঘের পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলেন।

শেষকালে আত্মরক্ষার অন্য কোন পথ না পেয়ে দক্ষিণরায় বড় গাজীর কাছে আশ্রয় নিলেন। এই বড় গাজী বা বরকন গাজী হলেন জঙ্গলের ধনের অধিকারী। ইনি জাতিতে মুসলমান। এর পিতার নাম শেখ সেকেন্দার। শেখ সেকেন্দারের ছিল অঢেল ধনরত্ন। তিনি সমস্ত ধনসম্পত্তি ভাটি অঞ্চলে মাটিতে পুঁতে রেখেছেন। বরকানগাজী আবার দক্ষিণ রায়ের আদিগুরু, মা বনবিবির কল্যাণে সাজঙ্গলি বিনাবাধায় বাদাবন জঙ্গল পার হয়ে চললেন। কোন হিংস্র জন্তুই তার পথরোধ করতে পারল না। সামনে পড়ল নদী। মায়ের কল্যাণে সেই নদীর জল এক হাঁটু হয়ে গেল। সাজঙ্গলি তা অনায়াসেই পার হয়ে গেলেন। দক্ষিণরায় নদীর কুমীরদের বললেন তারা যেন সাজঙ্গলিকে ভক্ষণ করে। কুমীরের দল মার মার শব্দ করতে করতে ধেয়ে এল। কিন্তু উন্মত্ত সাজঙ্গলির হাতে ভয়ঙ্কর খাপড়া দেখে তারাও প্রাণ ভয়ে পালিয়ে বাঁচল।

দক্ষিণ রায় সাজঙ্গলির হাত থেকে বাঁচবার জন্য বরকান গাজীর পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে বললেন, গুরুদেব বাঁচান। সাজঙ্গলিও সেখানে হাজির। তিনি তো দক্ষিণ রায়কে মেরেই ফেলবেন, প্রচণ্ড রাগ তাঁর।

কিছুতেই আর থামানো যায়না তাঁকে। অনেক কষ্টে বরকান গাজী সাজঙ্গলিকে একটু শান্ত করলেন। বরকান গাজীরই পরামর্শে দক্ষিণরায় বনবিবিকে 'মা' বলে ডেকে ক্ষমাপ্রার্থনা চাইলেন। আর বললেন যে এমন কুকর্ম তিনি আর কোন দিনও করবেন না। তখন বনবিবি এবং সাজঙ্গলি তাকে ক্ষমা করলেন। তারা দক্ষিণ রায়কে বললেন, দুখেকে দেশে পৌছে দিয়ে আসতে। বরকান গাজী দুখেকে সাত গাড়ী ধনরত্ন দিলেন। দক্ষিণরায় দুখেকে 'ভাই' বলে জড়িয়ে ধরলেন।

এরপর দক্ষিণরায় ডাকলেন তাঁর বন্ধু কালুরায়কে। কালুবায় আবার কুমীরের দেবতা। তিনি দুখেকে পিঠেতে চাপিয়ে দুখেব দেশের ঘাটে নামিয়ে দিয়ে এলেন।

আঠারো ভাটির বাদা জঙ্গলে মা বনবিবি সর্বময়ী কর্ত্রী হলেন। ভুরকুণ্ডুতে তাঁর আসন হল নির্দিষ্ট।

এদিকে মনের সুখে ধনা-মোনা তাদের সপ্তডিঙাতে মধু-মোম বোঝাই করে তাদের দেশের মাটিতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। মাঝি-মাল্লা লোকজন সবাই যে যার পাওনা-গণ্ডা সব বুঝে নিয়ে বাড়ী চলে গেল। আর মধু-মোম বিক্রি করে ধনা প্রচুব সম্পত্তির অধিকারী হল।

দুখের মা বাদা থেকে সবাই ফিরে এসেছে শুনে দুখের খোঁজে ছুটে এলেন ধনার বাড়ীতে। কিন্তু নিষ্ঠুর ধনা হতভাগিনীকে জানাল যে তার পুত্র দুখে জঙ্গলে কাঠ আনতে গিয়ে বাঘের মুখে পড়ে প্রাণ দিয়েছে। এই না শুনে দুখের মা প্রচণ্ড কাঁদতে লাগল। কেঁদে কেঁদে তার প্রায় অন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা হল। স্নান-খাওয়া তার সমস্ত বন্ধ হয়ে গেল। দুখের মা অবিরত বনবিবিকে এই বলে ডাকতে লাগল যে সে তার কোলেতে তার একমাত্র পুত্রকে সমর্পণ করেছিল। আর বিনিময়ে তিনি তার একি সর্বনাশ করলেন। তার একমাত্র ছেলেকে তিনি কিনা বাঘের পেটে দিলেন।

এমন সময় দুখে "মা মা" বলে চিৎকার করতে করতে মায়ের কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অভাগিনী মায়ের সঙ্গে পুত্র দুখের মিলন হ'ল। সে ছেলেকে আদর করে তার বুকে তুলে নিল।

তারপর দুখের মুখ থেকে তার মা সমস্ত ঘটনা শুনলে মা বনবিবির কল্যাণেই যে দুখে জীবন নিয়ে ফিরে এসেছে সেটা বুঝতে আর তার বাকি রইল না।

দুখেরও বনবিবির প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। সে গলায় কুড়ুল বেঁধে বাড়ী বাড়ী গিয়ে মাগন চেয়ে নিয়ে খুব ঘটা করে মা বনবিবির পুজা করল। দান-খয়রাতিও করল। দুখে চাল, দুধ, মিষ্টি দিয়ে খোবাক্ষীর তৈরী করে মায়ের ভোগ দিল। মহাধুমধামে পুজা শেষ হল।

এদিকে ধনা লোকের মুখ থেকে দুখের সমস্ত কথা শুনছে। দুখে যে বন থেকে বেঁচে এসেছে, সে যে মা বনবিবির কৃপালাভে সমর্থ হয়েছে এবং মায়ের পুজা করেছে এ সমস্ত জানতে পেরে সে বেশ ভয় পেয়ে গেল। ধনা ভাবল এই বুঝি দুখে তার কাছে এসে তার আচরণের কৈফিয়ৎ চায়। ধনা চিন্তা করল দুখে যদি হাকিমের কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ করে তাহলে নিশ্চয়ই তার গর্দান চলে যাবে। সত্যসত্যই দুখে তার মাকে বলল যে সে ধনার বিরুদ্ধে হাকিমের কাছে নালিশ করবে। তখন তার মা বললে যে ধনা খুব ধনী লোক। ওর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কোন লাভ হবে না। তারা গরীব, দুবেলা ভালো করে খেতে পর্যন্ত তারা পায় না। সুতরাং তাদের পক্ষে ধনীর বিরোধিতা করা সাজেনা।

এই শুনে দুখে বলল যে বনবিবির কৃপায় বরকান গাজী তাকে সাত ঘড়া ধন-দৌলত দিয়েছেন। তাদের আর কোন দুঃখ নেই। দুখের মা জানতে চাইল কোথায় তার সেই ধন। দুখে বলল যে বাড়ীর পূর্বদিকে যে তাল গাছ আছে, সেখানে সমস্ত ধন গাড়া আছে। সেই ধন নিয়ে এসে তা বিক্রি করে সে বড় বাড়ী তৈরী করবে।

রাত্রিতে দুখে কোদাল হাতে সেই তাল গাছের তলায় গিয়ে মাটি খুঁড়তে সাতটা ঘড়াতে কোদাল লেগে ঠং ঠং আওয়াজ হতে লাগল। কিন্তু সেগুলো দুখে কোন মতেই তুলে আনতে পারল না। তার মনে হল যেন সেগুলি মস্ত মস্ত পাথরের বিরাট চাঁই। দুখে এখন ভাবতে লাগল বরকনগাজী নিশ্চয়ই তাকে ঠকিয়েছেন। মা বনবিবির কাছে বাধ্য হয়ে ধন দেবে বলেছেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সমস্তই মিথ্যা।

দুখে ধন না পেয়ে মনের দুঃখে কোদাল হাতে বাড়ীর দিকে চলল। এদিকে সাতটা চোর দূর থেকে দুখের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। তারা দুখের হাত

থেকে কোদাল কেড়ে নিয়ে পুনরায় নির্দিষ্ট স্থানটি খুঁড়তে লাগল। দেখতে দেখতে সাতটি ঘড়া উঠে এল। চোরেরা তো মহানন্দে সেই ঘড়ার মুখ খুলেছে। আর যায় কোথায় ভেতর থেকে সাপ ফোঁস করে উঠল। সাপ দেখে ত চোরেরা ভয়ে অস্থির। পরে তারা মতলব করল যে দুখে নিশ্চয়ই তাদের মারতেই ষড়যন্ত্র করেছে। তাই ঐ রকম সাপ পুরে রেখেছে ঘড়াতে। তারা তখন এর প্রতিশোধ নিতে চাইল। দুখে যেমন চোরদের সাপ দিয়ে মারতে চেয়েছিল, চোরেরাও সেরকম সাপ দিয়ে দুখেকে মারতে চাইল। তারা ঘড়া সাতটি কে দুখের বাড়ীতে ফেলে দিয়ে পালাল।

আওয়াজ শুনে দুখে বাইরে এসে দেখে তো আশ্চর্য হয়ে গেল। বাড়ীর উঠোনে সেই সাত সাতটি ঘড়া বসানো। সঙ্গে সঙ্গে ঘড়াগুলির মুখ খুলে দেখল ঘড়া ভর্তি সব রত্ন মোহর রয়েছে। দুখের বুড়ী মা তো এসব দেখে খুব খুশী। দুখে তাড়াতাড়ি সাতঘড়া ধন ভেতরে নিয়ে গিয়ে রাখল।

এইভাবে দুখে ধন পেয়ে ধনী হল। সে একটা বড় বাড়ী করবে বলে ঠিক করল। কিন্তু বাড়ী করতে গেলে তো কাঠ চাই। এখন সে কাঠ কোথা থেকে পাবে? তার মনে পড়ল বাদার দক্ষিণ রায় হলেন কাঠের মালিক। তার কাছে গেলেই কাঠ পাওয়া যেতে পারে। এই ভেবে দুখে নদীর ধারে গিয়ে দক্ষিণরায়কে ডাকতে লাগল। দুখের ডাক শুনে দক্ষিণরায় দুখেকে দেখা দিলেন। দুখে তাঁকে তার প্রয়োজনের কথা জানাল, জানাল যে কাঠের দরকার। তখন দক্ষিণরায় তিন লাখ কাঠ জলে ভাসিয়ে দিলেন। কাঠগুলি দুখের দেশের মাটিতে গিয়ে লাগল। কিন্তু শুধু কাঠ হলেই তো আর বাড়ী হবে না। এজন্য দরকার মজুর মিস্ত্রীর। দুখের মা বনবিবির স্মরণ নিলে। বনবিবির কৃপায় যদুরায় নামে একজন দুখের দেওয়ান হ'ল। যদুরায়কে মা বনবিবি স্বপ্ন দিয়ে দুখের দেওয়ান হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সকাল হওয়া মাত্র যদুরায় ছুটল দুখের বাড়ির উদ্দেশে। দুখেকে গিয়ে সে সব বলল। দুখের কাছ থেকে ধনরত্ন নিয়ে সে বিরাট বাড়ী তৈরী করতে আরম্ভ করল। প্রচুর লোক জন মিস্ত্রী সব কাজে লেগে গেল। নায়েব, খাজাঞ্চি, গোমস্তা এরাও নিযুক্ত হল। কোটাল, দারোয়ান তারাও এল। পেয়াদা, দাসী, বাঁদী তারাও সব নিযুক্ত হল। শেষে দুখে দেশের রাজা হয়ে বসল। গরীব-দুঃখীদের সে দান—খয়রাতি করতে লাগল। দুখের রাজত্বে দীন-দুঃখী গরীব প্রজারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। সকল প্রজা দুখের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

দুখে রাজি হল। দেশে চোর-ডাকাত বলতে আর কেউ রইলনা।

ধনা দুখের উন্নতির সব খবরই পাচ্ছিল। সে ভয়ে কাঁপতে লাগল। যত দুখের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ততই ধনা ভীত হয়ে পড়তে লাগল। সে ভাবতে লাগল এই বুঝি দুখের লোক-লস্কর এসে তাকে পাকড়ে নিয়ে যায়।

একদিন দুখে প্রচার করল যে তার রাজ্যের সকল লোককে সে দেখতে চায়। সারা দেশ থেকে বহু লোক এসে উপস্থিত হল। ধনা হাজির হল না। দুখের দেওয়ানের আদেশে পেয়াদা-দারোয়ান ধনাকে তলব করে আনতে গেল।

নিরুপায় ধনা কাঁপতে কাঁপতে দুখের দরবারে হাজির হল। মানে হতে বাধ্য হল। সেলাম করে ধনা দাঁড়াল। তখন দুখে বলল, "চাচা কেঁদখালির কথা মনে পড়ে? তুমিতো আমাকে বাঘের মুখে ফেলে দিয়ে চলে এলে। এখন দেখ সেই আমি মা বনবিবির দয়ায় কেমন বেঁচে ফিরে এলাম।"

ধনা নিজের বিপদ বুঝতে পারল। সে কাঁদতে কাঁদতে দুখের পায়ে গিয়ে পড়ল। এবং তাকে ক্ষমা করার জন্য বললে। ধনার অবস্থা দেখে দুখের দেওয়ান যদুরায় এবং অন্যান্য সকলের মনে ধনার জন্য দয়া হল।

দেওয়ান যদুরায় এবং অন্যান্য কর্মচারীদের অনুরোধ মত ধনাকে তখন কার মতো মুক্তি দিল। তবে দুখে ধনাকে প্রচণ্ড ভাবে শাসিয়ে রাখল। সাময়িক ভাবে মুক্তি পেল ঠিকই, কিন্তু ধনার এক চিন্তা ভবিষ্যতে দুখের আক্রোশ থেকে বাঁচা যায় কি করে। শেষ পর্যন্ত কোন উপায় না দেখে ধনা কাতর হয়ে মা বনবিবির স্মরণ নিল।

বনবিবি ধনাকে রাত্রে স্বপ্নে দেখা দিয়ে সাহস দিলেন এই বলে যে তার কোন ভয় নেই। তবে নির্দেশ দিলেন সে যেন তার মেয়ের সঙ্গে দুখের বিয়ে দেয়। তারপর বনবিবি দুখেকেও স্বপ্ন দিয়ে বললেন সে যেন দুখের মেয়ে চম্পাকে বিবাহ করে।

সকাল হলে ধনা কয়েকজন ভালো ভালো লোক নিয়ে দুখের দরবারে উপস্থিত হলে ধনাকে দুখে জিজ্ঞাসা করল, 'এত সকালে কি মনে করে?' তখন ধনা বনবিবির নির্দেশের কথা বললে। দুখে ধনার প্রস্তাবে রাজি হল।

তার পর দুখের মা একটা দিন স্থির করলে। সারা বাড়ীতে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। দাস দাসী, দারোয়ান, পেয়াদা যে যেখানে ছিল সকলে আনন্দে মত্ত হল। সারা রাজ্যে যেন আনন্দের মেলা বসে গেল। দোকান পসার সব বসল। কাতারে কাতারে লোকজন সব আসতে লাগল। দীন-দুঃখী কত প্রজা

যে রাজবাড়ী দুবেলা খেতে লাগল, তার কোন হিসেব রইল না।

লোক লস্কর নিয়ে মহা ধূম ধাম করতে করতে দুখে চলল বর সেজে ধনার মেয়ে চম্পাকে বিয়ে করতে। মোল্লা কাজি সকলে মিলে দুখের সঙ্গে চম্পার বিয়ে দিয়ে দিল।

নতুন স্ত্রীকে নিয়ে দুখে সকলকে সেলাম জানাল। দুখে তার নববধূকে নিয়ে তার মায়ের চরণে প্রণাম করল। বুড়িমা চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ছেলে-বউকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। চম্পাকে বার বার চুম্বন করে আশীর্বাদ করলে।

পুলকিত দুখে তার প্রজাদের প্রচুর দান করলে—খয়রাতি করল। আনন্দের আতিশয্যে সে বনবিবিকে বিস্মৃত হয়নি। মা বনবিবির নামে ক্ষীর পাকিয়ে ভোগ দিল। কাঙাল, গরীব, আতুর, দীন, দুঃখী যত লোক সব কত যে খুশী হল তার আব হিসেব রইল না। খুশীর চোটে দুখে প্রজাদের তিন বছরের জন্য খাজনাই মুকুব করে দিল।

তারপর দুখে ঘরে গিয়ে নির্জনে বসে বনবিবির স্মরণ নিল। বনবিবি দুখেকে দর্শন দিলেন।

দুখে বলে, 'মা তোমাব দয়ায় আমি বাঘের হাত থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি। তোমার কৃপায় রাজা হয়েছি। তাবপর আমি চম্পাকে বিবাহ করলাম। আমার বউকে তুমি কৃপা করে যাও।'

বনবিবি তখন দুখের বৌ দেখলেন এবং চম্পাকে কৃপা করলেন। তারপর বনবিবি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পরিশেষে দুখে পালার কয়েকটি গান সংযোজিত হ'ল—

দুখে—কোথায় মা বনবিবি একবার দেখা দেও আমারে
বিপদে পড়িয়া মাগো মা বলিয়া ডাকি তোমারে।
আমি গরীব দুঃখী বলে যেও না মা আমায় ভুলে
ঐ চরণে স্মরণ নিলাম রক্ষা কর মা দয়া করে।
কোথায় মা বনবিবি, একবার দেখা দাও আমারে।
ভবের খেলা সাঙ্গ হল মা তোর দুখে বনে মরল
বিয়ে দেবে বলে চাচা এনেছিলে বনে—
ভালো বিয়ে দিলে চাচা কেদখালীর বনে

কোথায় আমার রইল মাতা, কোথায় পিতা,

বনে বুঝি জীবন গেল

আসিবার কালে মাগো বাধা দিয়েছিলে,

সেই বাধা হাতে হাতে আমার গেল ফলে।

বনবিবি—যাও যাও সাজঙ্গলী কাল বিলম্ব কোর না

আয়রে দুখে বেটা

বিপদ ভারি তাইতো আমার আসন টলে।

আজ মা বলে ডেকেছে রে, দখিনরায় সে বাঘ হয়ে

দুখেকে খেতে এসেছে।

তুমি গিয়ে মার তাকে আমার জীবন জুড়াক রে।

যাও যাও সাজঙ্গলী কাল বিলম্ব কোর না রে

দুখে আমার অবোধ ছেলে

আজ মা বলে ডেকেছে রে।

দুঃখী দুখের গান

এই দেহ ত্যাগ কররে প্রাণ

খেওনা আর দানা পানি

আমার জন্য মা জননী

শুনিতেছে কটুবাণী।

আমরা গরীব দুঃখী বলে

পাড়ার লোক কতই বলে—

তুমি দেহ ছাড়া হলে বাঁচবে আমার মা জননী।

মায়ের কাছে আর যাব না।

ক্ষুধা পেলে আর খাব না।

ক্ষুধার দায়ে প্রাণ ত্যজিব, বাঁচবে আমার মা জননী।

ধনাকে দুখে বলে—

শোন ধনা চাচা আমার, দুঃখের কথা কি বলা আর

কপালেরই ফেরে চাচা, পরের গরু রাখি এবার।

ঘরে দানা নাহি ছিল ; বাপজী আমার মউত হলো।

বেহালাতে ফেলে গেল চাচা ডাকিতেছে তাই

আকুল পাথার

বিবিজান (ডুখের মা)

যারে ফিরে ওরে ধনা আমার বাড়ি আর এসনা।
তুমি আসতে যখন, তোমায় করতাম যতন।
এখন দেখি তোমায় কুমন্ত্রী।
ঐ না ডুখে আমার বুকের নিধি
আমি সে নিধি তোমায় দেব না।
যাবে ফিরে ওরে ধনা, আমাব বাড়ি আর এস না।

ডুখে—

আমার সফল হল ঐ জনম
এ বিশ্বমাঝারে না হেবি কাহাবে
ধরি বাবে বার মায়েরি চরণ
দয়ার মা বনবিবি মনেরি মাঝারে।
বিপদ কালেতে পেয়েছি তাহারে
বিপদ তাবিণী বিপদ হারিণী
বিপদে পেয়েছি মাগো ও রাঙা চরণে॥
কার কাছে যাবো গো আমি রহিব কোথায়।
বড নিরুপায় আমার হায় হায় হায়
বাপ নাইকো, মা নাইকো, নাইকো আমার কেহ
এ সংসারে আমি গো একা পাই না কারো স্নেহ।
কার কাছে যাবো গো
আমি রহিব কোথায়॥
ভিক্ষা দাওগো নগর বাসী
মায়ের খয়রাত দিব গো
আপনারা সবাই দিলে ভিক্ষা
—মায়ের খয়রাতি দিব গো।

শেষ কোরাণ পাঠ—

এলাই আলমনি আল্লা জান মুজে তেরা
গনা খাতা মাপ কর, এরাজ জমেরা॥
আমি তো কমিনা, নেকোভক্তি নেকো রাহা

বুকাই-মু ছের আল্লা উঠাই-মু হাত
তোমার দরগার করি এই মনো জাত
হোক নোঃ হিলিল্লা মহম্মদ রসুলিল্লা।
আল্লা হো আকবর॥

ফরিদপুর

হেঁচড়া

হেঁচড়া বা হেঁচেড়া হলেন কারো কারো মতে সূর্য, আবার অনেকে এঁকে 'ঠাকরুণ' বলে অভিহিত করে থাকেন। মোটামুটি ভাবে ফরিদপুর জেলার কোন কোন অঞ্চলেই এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। সারাটা পৌষ মাস ধরেই এই অনুষ্ঠান চলে। মতান্তরে সমগ্র মাঘ মাস ধরে চলে পূজা। অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান কিশোর-কিশোরীই এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে থাকে। উল্লেখ্য, হেঁচোড়া তার উপাসকদের মতই অল্প বয়সী। পৌষ মাসের প্রথম দিন সন্ধ্যাবেলায় সকলে সমবেত হয়ে বাড়ীর যে কোন একটি গাছের তলায় চারপাশ পরিষ্কার করে। তারপর মাটি দিয়ে উঁচু করে। এর পর নানা ধরণের ফুল সংগ্রহ করে এনে গাছের গুঁড়িটিকে সাজায়। মুচিতে তেল দিয়ে তাকেই প্রদীপের মত করে জ্বালায়। এরপর শুরু হয় সমবেত কণ্ঠে গান। এইভাবে সারাটা পৌষ মাস চলে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ঘণ্টা দুয়েক ধরে চলে হেঁচড়া পূজার গান বা আবৃত্তি। কোন কোন স্থানে আবার সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলাই এই ধরণের অনুষ্ঠান চলে। তবে অনুষ্ঠান হয়—সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পরে।

যে কোন গাছ হলে হবে না, শুধুমাত্র কুলগাছ পুঁতেই হেঁচড়া পূজা সম্পন্ন করা হয়। কুলগাছটি পুঁততে হয় উঠানে। মোটামুটি ভাবে বাসগৃহের দাওয়ায় কোন সুবিধাজনক জায়গায় বালক-বালিকারা দোলমঞ্চস্থিত ভিটার মতন একটি ক্ষুদ্রাকৃতির বেদি প্রস্তুত করে। এই ভিটার ওপর একটি মাঝারি ধরণের কুলগাছ বা শাখা পুঁতে দেওয়া হয়। বিশ্বাস করা হয় এই শাখাতেই

হেঁচড়া দেবী অধিষ্ঠিত হলেন। প্রতিদিনকার ফুল একদিকে সরিয়ে রেখে নতুন ফুল দিয়ে গাছের তলদেশ সজ্জিত করতে হয়। অতঃপর মাঘ মাসের প্রথম দিন ভোর ভোর ঘুম থেকে উঠে কিশোর-কিশোরীরা হেঁচড়া পূজার ফুলগুলি নিকটবর্তী জলাশয়ে ভাসিয়ে দিয়ে তারপর স্নান করে বাড়ী ফেরে। মতান্তরে মাঘ মাসের সংক্রান্তি তিথিতে ফুলগাছটির বিসর্জন দেওয়া হয় যেমন দেবী মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয় সেইভাবে। এইভাবেই এই অনুষ্ঠানের ঘটে পরিসমাপ্তি।

হেঁচড়া পূজার ছড়া একটি উদ্ধার করে দেওয়া হল—

হেঁচোড়া ঠাকুরুণলো ফ্যাঁচোড়া চুল।
তাতে কি শোভে লো গাঁদা ফুল॥
গাঁদা ফুলের দিলাম বিয়া।
পাড়া পড়সী লো জয় জোকার দিয়া॥
জয় দিব না লো জোকার দিব।
সোনার যাদুধন কোলে তুলে নেব॥

ময়মনসিংহ

পাট ঠাকুর

ময়মনসিংহ জেলার আটিয়া পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিলমাবাদ বা সলিমাবাদ একটি গ্রামের নাম। এই গ্রামের বাসিন্দারা অধিকাংশই জাতিতে মুসলমান এবং কৈবর্ত্য। বহুকাল ধরে এখানে চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বস্তুতঃ পক্ষে এই মেলাটির জন্যই গ্রামটির প্রসিদ্ধি।

এখানে চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক পূজায় কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। তিন চার হাত লম্বা এবং কমপক্ষে আধহাত চওড়া শঙ্খ, চক্র, গদা এবং পদ্ম অঙ্কিত করে এবং মাঝখানে একটা ত্রিশূল প্রোথিত করে তার ওপর শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কাঠের তৈরী মূর্তিটি 'পাট ঠাকুর' নামে পরিচিত। চড়ক পূজা উপলক্ষে চৈত্র সংক্রান্তির দশ-পনের দিন আগে থেকেই এই পাট ঠাকুরের পূজা শুরু হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হল এই পূজায় আধিক্য ঘটে ভূতাবিষ্ট যোগিনীদের।

প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এই পাট ঠাকুরের চরণামৃতে ভূতের উপদ্রব সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিনই এই পূজার গুরুত্ব সর্বাধিক বলে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, আর সেই কারণেই—এই দিনই পাট ঠাকুরের কাছে বহু জনসমাগম ঘটে।

শিবের অপর নাম ভূতনাথ। পাট ঠাকুরকে শিবেরই প্রতীক রূপে গণ্য করা হয়ে থাকবে আর সেই কারণেই বোধহয় ভৌতিক উপদ্রব নিরসনে পাট ঠাকুরের সক্রিয় ভূমিকা কল্পিত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হল যে পাট ঠাকুরের প্রভাব বিশেষতঃ ভূতাবিষ্ট রোগিনীদের ক্ষেত্রেই সক্রিয়।

বাঘাই

ময়মনসিংহ জেলার নানাস্থানে পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে কৃষক বালকেরা এক ধরণের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে থাকে। অনুষ্ঠানটির আপাত উদ্দেশ্য হল ব্যাঘ্র দেবতার পূজার্চনা। ব্যাঘ্র দেবতা পরিচিত 'বাঘাই' নামে। পৌষ সংক্রান্তির আগে রাখাল বালকেরা দল বেঁধে প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী ঘোরে এবং এক ধরণের ছড়া আবৃত্তি করে ভিক্ষা করে। এই ছড়া পরিচিত 'বাঘাইর বয়াত' নামে। ছড়া প্রথমে একজন আবৃত্তি করে, তারপর অন্যান্যরা সমবেতভাবে আবৃত্তি করে। পৌষ সংক্রান্তির আগে বেশ কয়েকদিন ধরে এই ভাবে ভিক্ষা করে যা পাওয়া যায় তার বিনিময়ে কৃষক বালকেরা ক্রয় করে মিষ্টান্ন বা পিষ্টকাদির মত উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি। তার পর পৌষ সংক্রান্তির দিন তারা উপস্থিত হয় কোনও বনের ধারে। সেখানেই খাদ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয়।

একটা ত্রিভুজাকৃতির কুলো তৈরী করা হয়। কুলো তৈরী করা হয় খড় দিয়ে। তারপর এই খড়ের তৈরী কুলোয় মিষ্টি, পিঠে ইত্যাদি সাজিয়ে বনের ধারে বাঘাইর উদ্দেশে রেখে আসা হয়। অবশিষ্ট খাদ্য-দ্রব্যাদি কৃষক বালকেরা নিজেরাই ভক্ষণ করে। যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক এই উৎসবটির উৎপত্তি সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন—

'পূর্বকালে ময়মনসিংহের স্থানে স্থানে ভয়ানক জঙ্গল ছিল এবং তাহাতে বড় বড় ব্যাঘ্র বাস করিত। সম্ভবতঃ ব্যাঘ্র ভীতি হইতেই এই উৎসবের এইরূপ নাম করা হইয়াছে।'

একটি বাঘাইর বয়াত উদ্ধার করা গেল—

এই বাড়ীৎ আইলাম আগে দুষমন বাদীরে
খাইল বনের বাঘে,
বড ঘর বড ঘব, বড ঘরের উলুর ছানী,
লক্ষ্মী আইলান চারখানি।
আইলান লক্ষ্মী দিলাইন বর , চাউল কডিটি
বাইর কর।
চাউল দিবিনা কডি দিবি, বাঘাইর নামে
সিন্নী দিবি ,
চাউল না দিয়া দিলে কডি তারে কডি
লডিধরি
লডিধরি আনরে, সোনাব মুটুক ভাঙ্গরে !
সোনা না রূপা ডালা, এই ঘরখান দেখতে
ভালা।
বড বড চাটুনী, গীরতাইন বড গাথুনী,
ওগো গীরতাইন আনাইর বর, আমারে
দিবি কতর ধন ?
আমি মাগিয়া খাই, বাঘাইর চরণ গাই।
বাঘাই গেলেন চাগাইপুর, কিন্যা আনলাইন চম্পাফুল
চম্পাফুল বর্তমান, হাইস্যা বাইস্যা কর দান।
দান কইয়া পাইসা কি ? সুতার কাপড
হরতকী।

পরিশিষ্ট

ক.

'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা।'

কথাটার মধ্যে আপাতভাবে কিছুটা অতিশয়োক্তির সন্ধান হয়ত মেলে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে উক্তিটি কতখানি সত্য। কবি যখন উক্তিটি করেছিলেন তখন বঙ্গদেশ ছিল অখণ্ড; তাতেই বাংলাদেশের সমস্যা নেহাৎ কম ছিল না। আর পববর্তীকালে যখন অখণ্ড বঙ্গদেশ হ'ল খণ্ডিত, তখন সমস্যার পবিমাণ কমা দূরে থাকুক, আরও আরও অনেক পরিমাণে তা বৃদ্ধি পেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবির বাণী আজও সত্য। শত অভাব-অনটন এবং সমস্যা সত্ত্বেও বাঙ্গালী তার রঙ্গপ্রিয়তাকে ত্যাগ করতে পারেনি, আব পারবেও না কোনদিন সম্ভবত। সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে সমস্যার পবিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, বাঙ্গালী এসব সত্ত্বেও তার সজীব মানসিকতার পরিচয় বেখেছে নানাবিধ উৎসব কলার মধ্যে। যেদিন বাঙ্গালী তার এই উৎসব প্রিয় মনটাকে হারিয়ে ফেলবে, যেদিন তার জাতিগত বৈশিষ্ট্যটিও লোপ পাবে বলা যায়।

সজীবতার লক্ষণ হল পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেওয়া তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করা। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে আমূল পবিবর্তন ঘটে গেছে, তা আমাদের মানসিক সজীবতারই পরিচয়বাহী। উৎসবকলার ক্ষেত্রেও ঘটে গেছে সুদূর প্রসারী পরিবর্তন। ব্যক্তিগত প্রয়াসে একদা যে পূজার্চনা কিংবা উৎসবকলা অনুষ্ঠিত হ'ত, বর্তমানে তা রূপান্তরিত হয়েছে সার্বজনীন মহোৎসবে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। অবশ্য একথাও সেইসঙ্গে স্বীকার্য, অতীতের সব কিছুই বিলুপ্ত হয়ে যায় না। যুগের নিয়মে অতীতে অনুষ্ঠিত হ'ত এমন অনেক উৎসবকলা ম্লান হয়ে গেছে, চরিত্রেরও অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে স্বীকার করে নিলেও আজও অতীতকাল থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এমন লোক-উৎসবের স্বাক্ষর মেলে। উল্লেখযোগ্য,

উৎসবপ্রিয় বাঙ্গালী একদিকে যেমন শাস্ত্র নির্দিষ্ট নানাবিধ পূজার্চনায় ব্রতী হয়, তেমনি এইসব লোক উৎসব এবং লৌকিক দেব দেবীদের অর্চনায়ও ব্রতী হয়। তুলনামূলক বিচারে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানাদির তুলনায় লৌকিক দেব-দেবীদের আরাধনা তথা লোক-উৎসবের সংখ্যা আজও বাংলাদেশে অনেক অনেক গুণ বেশি। কোন কোন ক্ষেত্রে লৌকিক উৎসবের মর্যাদা বৃদ্ধি কল্পে কিংবা সাঙ্গীকরণের প্রতি আত্যন্তিক মোহবশতঃ কিছু কিছু শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানকে এইসব উৎসবের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য এসব অনেক পরবর্তীকালের ব্যাপার।

লোক-উৎসব শুধু লোকের উৎসব নয়। গণতন্ত্রের সংজ্ঞার মত বলা চলে লোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত, লোকের জন্য, লোকের উৎসব। সাধারণ উৎসবের সঙ্গে লোক-উৎসবের পার্থক্য অনেকখানি। সাধারণ উৎসবেও জনগণ অংশগ্রহণ করে থাকে, আবার লোক-উৎসবেও জনগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। তবু লোক-উৎসব এবং সাধারণ উৎসব এক পর্যায়ের নয়।

সাধারণ উৎসবের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানাদির ঘনিষ্ঠ যোগ। দেশের প্রায় সব অঞ্চলের মানুষই এইসব উৎসব কলার সঙ্গে পরিচিত। এবং সর্বত্রই প্রায় একই রীতিতে এইসব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া নৃত্য-গীতাদি এর অপরিহার্য অঙ্গ নয়। সাধারণ বা ধর্মীয় উৎসব অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত প্রয়াসে, ব্যক্তিগত লাভের আশায় অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু লোক-উৎসব দেশেব সর্বত্র একই রীতিতে অনুষ্ঠিত হয় না। আসলে হবার সম্ভাবনাই থাকেনা। কারণ লোক-উৎসবগুলি একান্তভাবেই আঞ্চলিক। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের মধ্যেই এগুলির পরিচিতি বা অনুসৃতি সীমাবদ্ধ। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের মানুষেরাই এইসব উৎসবের আয়োজন করে এবং অংশগ্রহণ করে। মনে রাখা দরকার লোক-উৎসব অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংহত সমাজের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। যেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রয়াসে উৎসব আয়োজিত হয়,সেক্ষেত্রেও নিছক ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ চরিতার্থতার সঙ্গে উৎসব যুক্ত থাকে না। অর্থাৎ সমষ্টির স্বার্থও যুক্ত হয়। অর্থাৎ বলা চলে উদ্দেশ্য ও চরিত্রের বিচারে আধুনিক কালের সার্বজনীন পূজার সঙ্গেই লোক-উৎসবের সাদৃশ্য বেশি।

শাস্ত্রীয় অনুশাসনের দ্বারা আবদ্ধ যে উৎসবকলা তাতে পৌরোহিত্যের অধিকার একমাত্র ব্রাহ্মণের। অব্রাহ্মণের এসব ক্ষেত্রে পৌরোহিত্যের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু লোক-উৎসবে কদাচিৎ ব্রাহ্মণকে পৌরোহিত্য করতে দেখা গেলেও আসলে এ ব্যাপারে অব্রাহ্মণদের ভূমিকাই বেশি। লোক-উৎসবের

উপচারে প্রচলিত নির্দিষ্ট উপকরণাদি অপরিহার্য নয়।

লোক-উৎসবের কারণ অনুসন্ধান করে বলা যায় যে কারণে সমাজে সংস্কারের উদ্ভব, সেই একই কারণে লৌকিক দেব দেবী এবং লোক-উৎসবের উদ্ভব। অর্থাৎ বাঞ্ছিত লক্ষ্যে উপনীত হতে অলৌকিক শক্তির সহায়তা লাভ এবং ব্যর্থতা বা ক্ষতির সম্ভাবনাকে তিরোহিত করা। তবে এইটাই লোক-উৎসবের একমাত্র কারণ নয়। আনন্দলাভের তাগিদও এসবের সঙ্গে যুক্ত আছে বললে বোধকরি অত্যুক্তি হবেনা। মানুষ নিস্তরঙ্গ জীবনে হাঁফিয়ে ওঠে। কিছুটা বৈচিত্র্য তার চাই। লোক-উৎসবের উদ্ভবের মূলে সেই বৈচিত্র্য আস্বাদনের ব্যাকুলতা স্পষ্টতঃই ধরা পড়ে। আজ আমরা নিত্য নতুন কত না উৎসবের সঙ্গেই পরিচিত হচ্ছি, অনুষ্ঠিত হচ্ছে কৃষি মেলা, বই মেলা, মনীষীদের জন্মোৎসব পালন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পূর্তি উৎসব। তাছাড়া প্রমোদ উপকরণের বলিষ্ঠ মাধ্যম স্বরূপ চলচ্চিত্র, বেতার ইত্যাদি ত আছেই। অতীতে যখন এসবের উদ্ভব হয়নি, কিংবা দীর্ঘকাল ব্যাপী গ্রামের মানুষ এসব উপকরণাদির সঙ্গে পরিচিত হয়নি, সেইসঙ্গে এসব সংগ্রহের ব্যাপারে সামর্থ্যের অভাবও বর্তমান ছিল, তখনও গ্রামের মানুষ নানা সময়ে নানাবিধ উৎসবাদির আয়োজন করে নির্মল আনন্দ উপভোগ করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই উপলক্ষ্য হয়ত একটা থাকত, যা আজও থাকে, কিন্তু অবিমিশ্র আনন্দ লাভকে লক্ষ্য বললে বোধকরি বেশি বলা হবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোক-উৎসবের সঙ্গে বিশেষ কোন দেবতা বা দেবীকে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সেখানে কোন মতেই তেমন গুরুত্বলাভ করেনি। তাছাড়া এইসব দেবদেবীকে রক্ত মাংসের মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেব দেবীদের কোন মূর্তি পর্যন্ত কল্পিত হয়নি, শুধু নামেই তাঁদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ উপকরণ দেব বা-দেবী রূপে কল্পিত হয়েছেন। লোক-উৎসবে আচার অনুষ্ঠানের বাহুল্য যেমন কম তেমনি অন্য দিকে কিছু কিছু লৌকিক কাহিনী এবং কিংবদন্তী এইসব উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বলা চলে লোক-উৎসবের মুখ্য মূলধন মানুষের নির্মল হৃদয়, আর লক্ষ্য হল অকৃত্রিম আনন্দ লাভ।

আধুনিক জীবনযাত্রার প্রভাবে একদিকে যখন মানুষের জীবন থেকে অবকাশ বিলুপ্ত প্রায়, অস্তিত্ব রক্ষার কঠিন সংগ্রামে গ্রামের মানুষ ক্লান্ত, তেমনি অপর দিকে নিত্য নতুন আনন্দোপকরণের সৃষ্টি ও তাদের সহজ লভ্যতার ফলে অনেক লোক-উৎসবই বিলীন হয়ে গেছে অথবা যেতে বসেছে। যেগুলি আজও

টিঁকে রয়েছে সেগুলির তীব্রতাও যেন অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। লোক সংস্কৃতির অন্যান্য উপকরণাদির মত লোক-উৎসব এবং লৌকিক দেব-দেবী সংক্রান্ত তথ্যাদির গুরুত্ব অপরিসীম। সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃতির অন্তরালে নিমজ্জিত হবার পূর্বে তাই এগুলির যথাযথভাবে সংগ্রহ বিশেষ প্রয়োজন।

খ. সম্প্রীতির প্রসারে লোক-উৎসব

লোক-উৎসবগুলির দুটি দিক আছে—একটি ব্যবহারিক দিক আব একটিকে বলতে পারি ভাবের দিক। ব্যবহারিক দিক বলতে আমবা এর প্রয়োজনের দিকটির প্রতিই ইঙ্গিত করতে চাইছি। মূলতঃ লৌকিক দেব-দেবীদের পূজাকে কেন্দ্র করেই লোক-উৎসবের আয়োজন। আব লৌকিক দেব-দেবীদের আরাধনার মূলে যত না আধ্যাত্মিক মানসিকতা কার্যকরী, তার থেকেও ঐহিক প্রয়োজনই যে অধিকতর কার্যকরী, সে উল্লেখ আমরা ইতঃপূর্বেই করেছি। বন্ধ্যা রমণীব সন্তান লাভ, দুরারোগ্য ব্যাধি ধেকে মুক্তিলাভ, সর্পদংশন থেকে রেহাই, বাঞ্ছিত পরিমাণ কৃষিপণ্য লাভ, সন্তানের সুস্বাস্থ্যের প্রার্থনা ইত্যাদির মত কামনা-বাসনাগুলি জড়িত।

কিন্তু আমাদের আলোচ্য লোক-উৎসবের সম্প্রীতির দিক। লোক-উৎসবে, বিশেষত এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মেলাগুলি যেন মহামিলনের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় হিন্দু ও মুসলমানের সহাবস্থানের কথা। মালদহের জহরাকালীর পূজায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই অংশগ্রহণ করেন, গ্রহণ করেন পূজার প্রসাদ। এমন কি বৈশাখ মাসে জহরাকালীর বিশেষ পূজার্চনা উপলক্ষ্যে যে মেলা বসে তাতেও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বহু মানুষেরই সমাগম ঘটে। এখনও বর্তমান বাংলা দেশের বহু মুসলমান ভক্ত সীমানা অতিক্রম করে এপার বাংলায় জহরাকালীর পূজা দিতে এবং দেবী দর্শন করতে এসে থাকেন।

হাওড়ার বাগনান থানার কাঁশরা গ্রামে যে আবদুল দীঘি আছে, সেখানেও স্নানযাত্রায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহু মানুষ অংশগ্রহণ করে থাকে। যদিও দীঘিটি আবদুল নামীয় জনৈক ফকিরের মাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু হিন্দুরা

তাই বলে এই দীঘিতে স্নান করতে কিংবা ফকিরের মাজারে সন্তানের সুস্বাস্থ্য কামনায় কুমড়ো অথবা নগদ পয়সা দিতে ইতস্তত: করে না। অপত্য স্নেহের ত আর কোন জাত নেই। হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ের অপত্য স্নেহের চরিত্রই এক, অন্তহীন এবং স্বর্গীয় সুষমা মণ্ডিত।

হুগলীর হরিপালের অন্তর্গত চকচণ্ডী নগরের গ্রামে বুড়ো দেওয়ানের যে মাজার আছে, সেখানেও উপস্থিত হতে দেখা যায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে। কারণ বিশ্বাস, বুড়ো দেওয়ানের কাছে নিজের পাপ স্বীকার করলে ভগবানের কাছে পৌছান যায়।

এইভাবে লৌকিক দেব-দেবীদেয় উপলক্ষ্য করে এবং লৌকিক উৎসবের কাবণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ, এমন কি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও একত্রিত হবার সুযোগ লাভ করে। পারস্পরিক সংশয়, সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের বিষ বাষ্প অন্তর্হিত হবার সুযোগ ঘটে। আসলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষেরই ঐহিক প্রয়োজন এক। সেই প্রয়োজনের কারণে শেষ পর্যন্ত সব মানুষ একত্রে মিলিত হবার প্রেরণা লাভ করে। তাছাড়া সব মানুষেব আন্তর ধর্ম যেহেতু এক, সেই অভ্যন্তরীণ ঐক্যও সকলকে একত্রিত হবার প্রেরণা দেয়। নদীয়ায় যে জঙ্গলী পীরের মেলা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে হিন্দু-মুসলমান একত্রে পংক্তি ভোজনে বসে। জঙ্গলী পীরকেও উভয় সম্প্রদায়েব মানুষই বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে থাকেন।

মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত সয়লা উৎসবের সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের তেমন কোন ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। যদিও মনসা পূজা ব্যতিরেকে এই উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন হতে পারেনা, কিন্তু এক্ষেত্রে কোন পার্থিব কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে মানুষ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেনা, অন্ততঃ কোন বৈষয়িক প্রয়োজন অথবা লাভালাভের সঙ্গে এই উৎসবের কোন যোগ নেই। নিছক বন্ধুত্ব স্থাপন এবং তাকে গভীরতা দানের জন্যই এই উৎসবের আয়োজন। মনসা পূজার আয়োজন নিছক দেবীর আশীর্বাদ লাভ করে বন্ধুত্বের সম্পর্ককে দৃঢ় করতে। এইভাবে আমাদের সচেতনতার অগোচরে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাম বাংলার লৌকিক উৎসব ও মেলাগুলি যে সম্প্রীতির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে- সমাজতত্ত্বের দিক দিয়ে তার বিশেষ তাৎপর্য বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন।

গ. দেব-দেবী রূপ কল্পনা

বাংলা দেশে যে অসংখ্য লৌকিক দেব-দেবীর অস্তিত্বের সন্ধান আমরা পাই এদের দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর দেব-দেবীর মূর্তি রূপ কল্পিত হয়েছে, কিন্তু আর এক শ্রেণীর দেব-দেবীর কোন মূর্তি বা অবয়ব কল্পিত হয়নি। শেষোক্তদের সংখ্যা মোটেই অকিঞ্চিৎকর হবে না, হয়ত বা বেশিই হবে। এখন প্রশ্ন হল কেনই বা এক শ্রেণীর দেব-দেবীর কোন মূর্তি কল্পিত হ'ল না, অপরপক্ষে আর এক শ্রেণীব দেবতাকে মূর্তিতে আবদ্ধ করা হল? আমাদের মনে হয় এর কারণ নিহিত রয়েছে দেব-দেবীর প্রভাবের ওপর। আসলে আদিতে লৌকিক দেব-দেবীরা সকলেই ছিলেন বিমূর্ত কল্পনা মাত্র। পরবর্তীকালে যতই বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীর প্রভাব ভক্ত সমাজে বিস্তারিত হল, ততই তাঁরা নিজস্ব মূর্তিতে ধরা পড়লেন। পৌরাণিক দেবতাদের সঙ্গে লৌকিক দেবতাদের পার্থক্যের সন্ধান এখানেও তাই পাই। অর্থাৎ লৌকিক দেব-দেবীদের মূর্তি কল্পনা বিবর্তনের সূত্রেই এসেছে। প্রথমাবধি তা আসেনি। এই প্রসঙ্গে আমরা কয়েকটি লৌকিক দেব-দেবীর মূর্তির উল্লেখ করতে পারি। যেমন প্রথমেই ধরা যাক বনবিবির প্রসঙ্গ। ও মালির বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের খুলনা অংশে জঙ্গলে মাটির ঢিবি করে পূজা দেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। যদিও গেজেটিয়ারে বনবিবির কোন উল্লেখ নেই, তবু অনুমান করা যায় বনবিবির পূজা প্রথমে এইভাবেই অনুষ্ঠিত হ'ত। মাটির ঢিবিই ছিল বনবিবির আদি রূপ। অন্যান্য নথিপত্রে বনবিবির উল্লেখ থাকলেও তাঁর কোন বর্ণনার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেনা। শেষে এই বনবিবিই হলেন ব্যাঘ্রাসনা দেবী। সঙ্গে রইলেন তাঁর ভ্রাতা সাজঙ্গলী। তাছাড়া ভক্ত দুখে সাহাকেও দেবীর কোলে অথবা সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা গেল।

ভদ্রেশ্বরী বা ভাদুমূর্তি প্রসঙ্গেও ঐ একই কথা। বর্তমানে ভাদুমূর্তি বললে দু ফিটের মতন উচ্চতা বিশিষ্ট হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট কখনও দণ্ডায়মানা অথবা পদ্মাসনা এক মূর্তির সঙ্গেই আমরা পরিচিত, যার এক হাতে ধানের শিষ বা পান বা কখনও পদ্মফুল শোভিত, অন্য হাতে থাকে কোন প্রকার মিষ্টান্ন। কিন্তু আদিতে নতুন সরায় গোবরের ওপর ভাদুই ধান ছড়িয়ে ভাদুর রূপদান করা হত। এক্ষেত্রেও বিবর্তনের সূত্রেই ভাদুর বর্তমান মূর্তি কল্পনা সম্ভব হয়েছে বলে

স্বীকার করে নেওয়া যায়। দুটি ক্ষেত্রেই মূর্তি কল্পনার মূলে এই দুই লৌকিক দেবীর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং প্রভাব যে সক্রিয় থেকেছে তা বলাবাহুল্য।

এইবার এমন কয়েকটি দেব-দেবীর উল্লেখ করা যেতে পারে, যাঁদের নির্দিষ্ট কোন অবয়বের পরিচয় আমরা পাইনা, বিশেষ বিশেষ প্রতীক অথবা বিমূর্ত কল্পনাকে আশ্রয় করেই এঁরা পূজিত হয়ে এসেছেন। মৎস্যজীবীদের আরাধ্য 'মাকাল ঠাকুর'কে মৃন্ময় স্তূপে পূজা করা হয়। এই স্তূপ আকৃতিতে ক্ষুদ্র, সংখ্যায় কখনও তা একটি আবার কখনও দু'টি। 'বাবাঠাকুরে'র কেবল মুণ্ডমূর্তি। ঘটের সঙ্গে এইমূর্তির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। 'যোগাদ্যা' শিলা প্রতীকেই পূজিতা। অবশ্য পাথরের ওপর এর খোদিত মূর্তিও দেখা যায়। 'ঢেলাইচণ্ডী' যদিও এক লৌকিক দেবী বলেই কল্পিত, কিন্তু এঁরও কোন মূর্তি নেই, পথ প্রান্তস্থিত একটি খেঁজুর গাছই দেবী রূপে অর্চিত হয়ে থাকেন। চব্বিশ পরগণার 'হাড়িঝি' মূলতঃ একটি পাথর খণ্ডেই অধিষ্ঠিতা। 'সিনি দেবী'রও নিজস্ব কোন মূর্তি নেই। সিন্দুর লেপিত একটি প্রস্তর খণ্ডকেই দেবীজ্ঞানে পূজা করা হয়। হুগলীর 'দ্বারিকা-চণ্ডী'র বর্তমানে কোন মূর্তি লক্ষিত হয় না। অবশ্য কথিত হয় যে পূর্বে এঁর অভয়া মূর্তি ছিল। পুরুলিয়ার 'মহামায়া' একটি ক্ষুদ্রাকৃতির প্রস্তর খণ্ডেই পূজিতা হন। বীরভূমের 'সুবিক্ষা দেবী' একটি দ্বিখণ্ডিত হাতে অর্চিত হন।

লৌকিক দেব দেবীদের কল্পনায় আমরা সর্বপ্রাণবাদের পরিচয় পাই। শুধুমাত্র চেতনা সম্পন্ন নয়, মাটির ঢিবি, প্রস্তর খণ্ডের মত অচেতন বস্তুকেও প্রাণশক্তি সম্পন্ন বলে কল্পনা করেছে আদিম কালের মানুষ। গাছকেও একইভাবে ঐশী-শক্তির অধিকারী বলে মানুষ বিশ্বাস করেছে। আর এইভাবে এইসব উপকরণ অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন লৌকিক দেব-দেবী অথবা তাঁদের প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

কিছু কিছু লৌকিক দেব-দেবীর গঠন পরিপাট্য কিংবা মূর্তির সৌন্দর্য মনো-মুগ্ধকর সন্দেহ নেই। যেমন এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি দক্ষিণ রায়, বনবিবি, ভাদু জরাসুর, রাজবল্লভী, উত্তরবাহিনী প্রমুখাদির। কিন্তু এইসব সৌন্দর্য চেতনা পরবর্তী কালের আরোপিত বলেই মনে করা যেতে পারে। চরিত্রে কিংবা আকৃতিতে পৌরাণিক দেবতাকে সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত এবং অনন্ত সৌন্দর্যের আকর রূপে কল্পনা করা হয়, এই আদর্শান্বিত রূপকল্পনা মানুষ যখন সভ্যতার অনেকখানি স্তর উত্তীর্ণ হয়েছে সেই সময়ের। এই সময় থেকে মানুষ দেবতার কাছে যেমন প্রার্থনা করেছে মুক্তি বা মোক্ষ, তেমনি দেবতাকে অর্পণ

করতে শুরু করেছে ভয় বিমুক্ত ভক্তি। মানুষের জীবন থেকে যত অনিশ্চয়তা এবং প্রাকৃতিক কারণ জনিত ভীতি ভাবনা দূরীভূত হয়েছে, তার মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য দেব-দেবী কল্পনাকেও স্নিগ্ধ করেছে। লৌকিক দেব-দেবীর অস্তিত্ব কল্পনার সময় মানুষ ছিল অত্যন্ত সংশয়াচ্ছন্ন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই ছিল চরম অনিশ্চয়তায় পূর্ণ। আশঙ্কা জর্জরিত ভীতি বিহ্বল অসহায় মানুষ তাই যেন তেন প্রকারেণ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার কারণে যেসব দেব-দেবীদের অস্তিত্ব কল্পনা করেছিল সেখানে ছিল অন্তহীন ভয়। অন্তহীন ভয় মিশ্রিত ভক্তিই নিবেদিত হয়েছে লৌকিক দেব-দেবীর উদ্দেশে। স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা বা ভক্তি সেখানে ছিল অনুপস্থিত। লৌকিক দেব-দেবী কল্পনাতে তাই এঁদের ভয়ঙ্কর, প্রতিশোধ স্পৃহাসম্পন্ন রূপেই দেখা গেছে। যেমন উল্লেখ করা যেতে পারে পাঁচু ঠাকুরের বিষয়টি। বীভৎস মূর্তি এই লৌকিক দেবতাটির। এঁর গায়ের রঙ কৃষ্ণবর্ণ। দুটি শিঙ বিশিষ্ট। দাঁতগুলি মুখের বাইরে বার করা। মাথায় ঝুঁটি বাঁধা চুল। আদিম কল্পনার বাস্তবায়িত রূপ। মহাদেবের সঙ্গে পঞ্চানন্দের আকৃতিগত সাদৃশ্য অনেকখানি হওয়া সত্ত্বেও, মহাদেবের মূর্তিতে আমরা যে একপ্রকার প্রসন্নতা লক্ষ্য করি, সেই প্রসন্নতার পরিবর্তে এক ধরণের রুক্ষতা বা উগ্রতা শুধু পঞ্চানন্দেই নয়, অধিকাংশ লৌকিক দেব-দেবীর আকৃতিতেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। একপ্রকার ভয়ঙ্করতার আবরণে যেন এঁরা আবৃত। এই বীভৎস রূপ থেকে সহজেই প্রতীতী হয় এঁরা কি অপরিমেয় শক্তির অধিকারী। আসলে আর্যেতর সমাজের মানুষ এঁদের অন্তহীন ক্ষমতাকে এইভাবে ভয়ঙ্কর রূপের মাধ্যমে প্রতিফলিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

লৌকিক দেব-দেবীদের মূর্তি প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজনীয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় লৌকিক দেব-দেবীদের কোন মূর্তিকে প্রকটিত না করে তাকে অপ্রকটিত করে রাখার চেষ্টা বিদ্যমান। যেমন মালদহের বিখ্যাত জহরকালী। এই লৌকিক দেবীর কোন মূর্তি পরিদৃশ্যমান নয়। মৃন্ময় ঢিবি কেবল দৃষ্টিগোচর হয়। বলা হয় এর মধ্যে নাকি জহরকালীর আসল মূর্তিটি বর্তমান। দেবী নিজেকে প্রকটিত করতে অনিচ্ছুক। তাই ঢিবির মধ্যে আত্মগোপন করে অবস্থান করছেন। সত্য সত্যই কোন মূর্তি ঢিবির মধ্যে আছে কিনা বলা শক্ত। আর যদিবা তা থেকেও থাকে তার আকৃতি হয়ত এমনই যা লোক সমাজের দৃষ্টিগোচর করার উপযুক্ত নয়। অদূর ভবিষ্যতে

যে সমস্ত লৌকিক দেব-দেবীর কোন স্থায়ী মূর্তি গঠিত হয়নি, সেগুলিকে সুদৃশ্য ও লাবণ্যমণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যাবে। এইভাবে পরিবর্তিত রুচি ও কল্পনায় হারিয়ে যাবে দেব-দেবীদের লৌকিক বীভৎস রূপ

ঘ. কয়েকটি লৌকিক দেবীর স্বরূপ বিচার

আমাদের দেশের অধিকাংশ লৌকিক দেব দেবীর উদ্ভবের মূলে ভীতির ভাব এবং দাক্ষিণ্য লাভের প্রয়াস কার্যকরী হয়েছে এই সত্য মেনে নিয়েও স্বীকার করতে হয় বেশ কিছু লৌকিক দেব-দেবী রক্তমাংসের মানুষ থেকেই সৃষ্ট। অর্থাৎ রক্তমাংসের মানুষ পরবর্তীকালে দেবত্বের অধিকারী হয়ে পূর্ব সত্তাকে বিসর্জন দিয়েছে। বলাবাহুল্য এই বক্তব্যের সমর্থনে যাকে বলে পাথুরে প্রমাণ, তা হয়ত দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু বক্তব্যের সমর্থনে এমন কিছু প্রমাণ দাখিল করা যেতে পারে যা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। নির্দিষ্ট প্রমাণের উল্লেখের পূর্বে আরও দু'একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে লৌকিক দেবতাদের তুলনায় লৌকিক দেবীরাই যেন বহুক্ষেত্রে মানবী সত্তা থেকে উদ্ভূত হয়েছেন। এর অবশ্য কারণও আছে। কারণটি হ'ল দেবতাদের তুলনায় দেবীদের কাছেই দাক্ষিণ্য লাভের প্রত্যাশাটা আমাদের অনেক বেশী হয়ে থাকে। পুরুষের তুলনায় নারীর মধ্যে মায়া-দয়া ধর্মের আধিক্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করার তা হ'ল যে সব দেবী মানবীদের রূপান্তরিত রূপ বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে, তাঁরা সকলেই প্রায় সমাজের অবহেলিত নিপীড়িত তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর থেকেই সৃষ্ট হয়েছেন। উচ্চবর্ণের রমণীকে তেমন ভাবে আমরা দেবীতে রূপান্তরিত হতে দেখিনা। একমাত্র ভাদুকে ব্যতিক্রম হিসাবে অবশ্য গ্রহণ করতে হয়। আর একটি কথা। মূলতঃ সেই সব মানবীই দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন, যাঁরা কোনো না কোনো ভাবে সমাজের প্রতিভূদের শক্তির দ্বারা চরমভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ অত্যাচারিত রমণীর প্রতি মানুষের সহানুভূতিই শেষপর্যন্ত তাকে দেবলোকে উত্তীর্ণ

করে দিয়েছে। কখনও আবার সমাজের প্রতিকূল শক্তি নিজের অত্যাচার —লাঞ্ছনাকে গোপন রাখতে, সাধারণের দৃষ্টিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবার বিশেষ উদ্দেশ্যে অত্যাচারিতাকে দেবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

সীমান্ত বাংলার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম কিংবা মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মহা সমারোহে এবং গভীর উদ্দীপনা সহকারে যে ভাদু পূজার আয়োজন করা হয়, সেই ভাদু সম্পর্কে যেসব কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তা থেকেই অনুমিত হয় ভাদু আসলে রক্তমাংসের এক মানবী, পরবর্তীকালে দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। কোনো কোনো কিংবদন্তীতে যদিও এঁকে দেবী দুর্গা বলে বলা হয়েছে, আসলে কিন্তু এটা পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্ত ব্যাপার। বিশেষত যখন দেখা যায় এই ধরণের কিংবদন্তী প্রচারের সঙ্গে পুরোহিতদের যোগ রয়েছে, তখন সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হয়। সাধারণ জনশ্রুতির একটিতে বলা হয়েছে রাজকুমারী এক সাধারণ তরুণের প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রেমিকের সঙ্গে মিলনে বাধা থাকায় ভাদু আত্মহননের পথ বেছে নেয়। অপর জনশ্রুতিতে দেখি পরদুঃখে কাতর ভাদু অত্যাচারিত অন্ত্যজ বাউরী বাগদীদের পক্ষাবলম্বন করায় রাজার আভিজাত্যে আঘাত লাগে এবং ব্যর্থমনোরথ হয়ে ভাদু আত্মহত্যা করে। ব্যর্থ প্রেমের জন্যই হোক কিংবা অত্যাচারিতদের পক্ষাবলম্বনের জন্যই হোক, শেষপর্যন্ত যে ভাদুকে আত্মহননের পথ গ্রহণ করতে হয়েছিল এ' দুটি কিংবদন্তী থেকে এই সাধারণ সত্যটুকু লাভ করি। আর এর ফলেই সাধারণ মানুষের সহানুভূতি অকালে মৃত্যুমুখে পতিতা ভাদুকে দেবীর পর্যায়ে উন্নীত করে। মানুষের কল্যাণে ব্যর্থকাম হয়ে থাকলেও সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা তার উদ্দেশে স্বাভাবিক ভাবেই উৎসারিত হয়েছে। আর ব্যর্থ প্রেমের জন্যও যদি তাকে জীবন উৎসর্গ করে থাকতে হয়, তবে সেক্ষেত্রেও ভাদু সংগতকারণেই মানুষের সমবেদনা লাভে সমর্থ হয়েছে। মোটেরওপর উভয়ক্ষেত্রেই প্রবল প্রতিপক্ষের প্রতিকূলতাই ভাদুর অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী হয়েছে। আর এই অকালমৃত্যুই তার জনসমর্থনকে পরিপুষ্ট করতে সহায়ক হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানার ন-পুকুর নামক গ্রামে রয়েছেন মা ডুমনী নামে এক লৌকিক দেবী। কেউ কেউ যদিও এঁকে বৌদ্ধ তারা মূর্তি বলে বিশ্বাস করে থাকেন, কিন্তু এঁর সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তীটি থেকেই আমরা সহজে এর প্রকৃত স্বরূপটি বুঝতে পারি। বলা হয় অতীতে এখানে গঙ্গা ছিল প্রবাহিত। এক ভূম্যধিকারী এই স্থান দিয়ে যাবার সময় পরমাসুন্দরী এক কিশোরীর রূপ

আকৃষ্ট হয়ে গান্ধর্ব মতে তাকে বিবাহ করেন। বিবাহ শেষে ফেরার সময় শুরু হয় প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি। ভূম্যধিকারীর লোক জনেরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে। নবোঢ়া কিশোরীটি তখন তাকে বাঁশ এনে দিতে বলে যা দিয়ে সে রান্নার ব্যবস্থা করবে। সেইমত বাঁশ এনে দেওয়া হলে সুন্দরীটি তার কটি বস্ত্র থেকে একখানি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বার করে বাঁশ কেটে রান্নার ব্যবস্থা করে। এতে ভূম্যধিকারীর সন্দেহ হয় মেয়েটি সম্পর্কে। তাঁর ধারণা হয় মেয়েটি নিশ্চয়ই ডোম-কন্যা। তা নাহলে বাঁশ কাটায় তার অমন নৈপুণ্য প্রকাশ পেত না। অতএব গভীর রাতে তাকে পরিত্যাগ করে ভূম্যধিকারী সদলবলে স্থানত্যাগ করেন। এদিকে নিরাশ্রয় অবস্থায় গভীর অরণ্য মধ্যে অপমানিতা কন্যাটি সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ে। দেহটি তার ক্রমে ক্রমে পাষাণে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এই পাষাণ মূর্তিই ডোমনী বধূ বা ডোমনী মা নামে পরিচিতি লাভ করে।

এক্ষেত্রে বুঝতে বাকি থাকেনা যে মেয়েটির সৌন্দর্যে আকৃষ্ট ভূম্যধিকারী লোভ দেখিয়ে কিংবা বলপ্রয়োগে তাকে বিবাহের নামে ভোগ করে তারপর আভিজাত্যবোধে আঘাত লাগায় তাকে পরিত্যাগ করে চলে যান। মেয়েটির তথাকথিত নীচ বংশোদ্ভূতা হওয়াই স্বাভাবিক। অন্ততঃ তার আচরণ তাই প্রমাণ করে। শেষপর্যন্ত ভূম্যধিকারীই হয়ত মেয়েটিকে হত্যা করে নিজের অপকীর্তি গোপন করতে তাকে দেবী বলে প্রচার করেছিলেন। কিংবা অত্যাচারিতা মেয়েটির পক্ষেও আত্মহননের পথ অবলম্বন করা অস্বাভাবিক নয়। সমাজের প্রতিপত্তিশালী মানুষের জৈবিক ক্ষুধা নিবারণার্থে এমন কত অসহায় নারীকেই যথাসর্বস্ব খুইয়ে মৃত্যুর পথকে অবলম্বন করতে হয়। মালদহের মানিক চকে 'ডোমনী' নামে যে মিশ্র লোকনাট্য প্রচলিত আছে, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিংবদন্তীটিও আমাদের পূর্বের অভিমতকেই সমর্থন করে। এখানে যে কিংবদন্তীটি প্রচলিত, তাতে বলা হয়েছে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বনে উপস্থিত হয়ে এক রূপবতী ডোম কন্যাকে দেখে তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। যুবকটি জ্বালানী সংগ্রহে ব্যর্থ হলে ডোম কন্যা তাকে কাঁচা বাঁশ কেটে আনতে বলে এবং নিজে কাটারি দিয়ে পাতলা করে কেটে কাঁচা বাঁশ থেকে জ্বালানী তৈরী করে দেয়। যুবকটি এরপর কন্যাটির প্রকৃত পরিচয় পেয়ে ঘৃণা পূর্বক তাকে ত্যাগ করে চলে যায়। ডোম কন্যা তখন একটি গাছের নীচে থান বা মণ্ডপ তৈরী করে পূজা দেয় এবং গান করে। এইভাবেই ডোমনী গানের সূত্রপাত। তার মানে এক্ষেত্রেও উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা

নিম্নবর্ণের মানুষের অপমানিত হওয়ার ঘটনাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আর অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষ তাদের একজন অপমানিত নারীকে দেবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে নিজেদের সাধ্যমত প্রতিশোধ নিয়ে থাকবে উচ্চবর্ণের মানুষের অপমানের। ২৪ পরগণার লৌকিক দেবী হাড়ি ঝিকে যদিও অনেকে কোন তান্ত্রিক দেবী, কিংবা রাঢ়ের কালিকা চণ্ডী বা মহাযান বৌদ্ধদের বারীতি দেবী বলে মনে করেন, তবু এই লৌকিক দেবীর অস্তিত্বের মূলে বাংলাদেশের প্রাক-আর্য যুগের হাড়ি জাতীয় কোন আর্যেতর রমণীর যেন সন্ধান পাই আমরা। পশ্চিম দিনাজপুরের গঙ্গারাম পুর থানার দেবীপুর ও বেলবাড়ী গ্রামের 'বুড়ি মা'-ও আসলে যে রক্ত মাংসের কোন মানবীর পরিবর্তিত রূপ নয় তা কে বলবে? বুড়ীমার আকৃতি হল ন্যুব্জদেহ, মাথায় রুক্ষকেশ এবং হাতে লাঠি। অবস্থান বটগাছের নীচে খড়ের এক জীর্ণ ঘরে। গায়ের রঙ অতসী পুষ্পের মত। বাস্তবে এমন কোন বুড়ী হয়ত এই অঞ্চলে ছিল, যে জীবনের সর্ববিধ সুখ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে অনন্ত দুঃখসাগরে নিমজ্জিত থেকে শেষে প্রাণত্যাগ করে পরবর্তীকালে দেবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। শিলাখণ্ড, বৃক্ষবিশেষের মত উপকরণকে যদি সর্বপ্রাণবাদে চেতনাসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করে নেওয়া হয়ে থাকে, তবে বিশেষ বিশেষ মানুষের মধ্যে দেবত্বের সন্ধান লাভকে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে কি?

৬. লৌকিক পূজা ও বৃক্ষ

লৌকিক পূজা এবং উৎসবে বৃক্ষের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তা আমরা অনায়াসেই বুঝতে পারি। আজও হিন্দুদের দ্বারা তুলসী, বেল, বট অশ্বত্থ ইত্যাদি গাছগুলি পবিত্র বলে বিবেচিত এবং পূজিত হতে দেখা যায়। বেদেও পাকুড়, বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞিডুমুর ইত্যাদি গাছগুলির দেবত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এমনকি বহুল পরিচিত দুর্গা পূজাতেও নবপত্রিকার এক বিশেষ ভূমিকা। এক্ষেত্রে কলাগাছের সঙ্গে থাকে অপরাজিতা, ডালিম্ব ইত্যাদি গাছগুলি। বিশেষজ্ঞের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়:

'Durga puja seems to be based on the cult of some vegetation spirit in as much as the worship of the nine plants known as Navapatrika, forms an important item of its various rituals. Sometimes the nine plants are addressed as goddess Durga herself.'

রাঢ় অঞ্চলে যে ইঁদ পূজা হয়ে থাকে, আসলে তা শাল গাছের পূজা ; কিংবা করম পূজা প্রকৃতপক্ষে করম বৃক্ষের পূজা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। চব্বিশ পরগণায় যে ঢেলাই চণ্ডীর পূজা অনুষ্ঠিত হয় তা আসলে একটি খেঁজুর গাছের পূজা। উত্তরবঙ্গে শেওড়া গাছকে বনদুর্গার অধিষ্ঠান জ্ঞানে পূজা করা হয়ে থাকে। দিনাজপুর-রংপুরে প্রচলিত ক্ষেত্রপাল ও মহারাজের পূজার উৎস বাঁশ-পূজা বলেই অনেকে মনে করে থাকেন।

বটগাছকে যে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান বলে বিশ্বাস করা হয়, তা দীর্ঘদিনের। এমনকি এই বিশ্বাসের প্রাচীনতার সন্ধান পাওয়া যায় গোবর্ধন আচার্যের একটি শ্লোকে, যেখানে তিনি বলেছেন গ্রাম্য লোকেদের কুঠারাঘাত থেকে যে বটগাছ রক্ষা পায় সেজন্যে কুবের বা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানকে দায়ী করা যদিই বা না যায়, অন্ততঃ পক্ষে মহিষের শৃঙ্গ তাড়নাকে এ ব্যাপারে দায়ী না করে উপায় নেই।

ত্বয়ি কুগ্রাম বটদ্রুম বৈশ্রবণো বসতু বা লক্ষ্মৌঃ।
পামরকুঠারপাতাৎ কাসরশিরসৈব তে রক্ষা ॥

শ্রীধর দাসের সদুক্তিকর্ণামৃতেও প্রস্তর ও বনদুর্গা পূজার সঙ্গে বৃক্ষতলে ক্ষেত্রপালের পূজার্চনার কথা বর্ণিত হয়েছে—

তৈস্তৈর্জীরোপ হারৈর্গিরি কুহরশিলা সংশ্রয়ামর্চয়িত্বা
দেবীং কান্তাবদুর্গাং রুধিরমুপতরু ক্ষেত্রপালায় দত্বা।
তুম্বীবীণা বিনোদ ব্যবহৃত সরকামহি জীর্ণে পুরাণীং
হালাং মালুরকোষৈর্বতি সহচরা বধরাঃ শীলয়ন্তি ॥

ফরিদপুরে সারাটা পৌষ মাস ধরে অল্প বয়সী ছেলে মেয়েরা মিলে যে হেঁচোড়া পূজার অনুষ্ঠান করে,আসলে তা কুলগাছের পূজা। বিশ্বাস করা হয় কুলগাছেতেই হেঁচোড়া দেবীর অধিষ্ঠান। বাঁকুড়া জেলায় এবং তাছাড়া বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়ায় যে জিতাষ্টমী পূজা হয়, তাও আসলে বটগাছের পূজা। অবশ্য কোন বটগাছকে পূজা করার পরিবর্তে নাতিবৃহৎ একটি বটডাল কেটে এনে বাড়ীর উঠানে তা পুঁতে দিয়ে তাকেই পূজা করা হয়। সাঁওতালদের

মধ্যে যে বাহা পরব প্রচলিত আছে, যাতে জাহের এরা, মঁড়েকো তুঁরুইকো, মারাং বুরু প্রমুখদের অর্চনা করা হয় তাও হয় শালবৃক্ষের তলদেশে। পূজায় শালফুল উপকরণ হিসাবে অপরিহার্য। মনসা পূজাতেও মনসা বৃক্ষের প্রয়োজন।

এখন প্রশ্ন হল এই যে নানা ধরণের বৃক্ষকে বহু প্রাচীনকাল থেকে পূজা করে আসা হচ্ছে, এর কারণ কি? মূল কারণ হল সর্ব প্রাণবাদ ও আরণ্যক জীবন। জীব জগৎ সর্বাধিক উপকৃত উদ্ভিদ জগতের কাছে। আদিম কাল থেকেই মানুষ তার ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে গাছের ফলমূল খেয়ে। এমন কি পশু মাংস, যা প্রথমাবধি মানুষের অন্যতম খাদ্যোপকরণ প্রকৃতপক্ষে তারাও ত উদ্ভিদ-জীবী। সে দিক দিয়েও মানুষ উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল থাকতে বাধ্য হয়েছে। পরবর্তীকালে কৃষি সভ্যতার উদ্ভব হলে মানুষ স্থায়ীভাবে সামাজিক জীবন-যাপন শুরু করেছে, আর এও তো সম্ভব হয়েছে উদ্ভিদকে কেন্দ্র করেই। মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে বাস করেছে, তখন তার নিরাপদ আশ্রয় রচিত হয়েছে বৃক্ষতলে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা দিয়েই। পথ শ্রমে বা পরিশ্রমে ক্লান্ত মানুষ বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়াতলে উপবেশন করেই বিশ্রাম সুখ ভোগ করেছে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে আগুনের আবিষ্কার এবং তার ব্যবহার এক যুগান্তকারী ঘটনা। পাথরে পাথরে ঠুকে আগুন জ্বাললেও তাকে দীর্ঘায়িত করতে মানুষকে সাহায্য নিতে হয়েছে বৃক্ষের ডালপালা, শুষ্ক পাতার। এই আগুন একদিকে যেমন শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যে অরণ্যাচারী মানুষকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করেছে, তেমনি এই আগুনের সাহায্যে মানুষ কাঁচা মাংসকে ঝলসে খাবার নতুন এক পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছে।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড অগ্নিবর্ষণ কিংবা বর্ষায় অঝোর ধারায় বৃষ্টি পতনের সময় অসহায় মানুষ বৃক্ষের আশ্রয়ে রক্ষা লাভে সচেষ্ট হয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করেছে, বিবাদ-বিসম্বাদের সুষ্ঠু মীমাংসা কল্পে কিংবা সালিশী করতে গোষ্ঠীর কর্তারা মিলিত হয়েছে বৃক্ষতলে। বর্তমানে আমরা যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে পরিচিত, এভাবেই তার উদ্ভব।

মানুষ যখন দেবার্চনায় ব্রতী হয়ে এর অপরিহার্য অঙ্গরূপে যজ্ঞের আয়োজন করেছে, তাতেও বৃক্ষের ওপরই তাকে নির্ভরশীল হতে হয়েছে। বেল, যজ্ঞি-ডুমুর প্রভৃতি বৃক্ষের কাঠ যজ্ঞ কার্যে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষ তার জ্ঞান উন্মেষের ঊষা লগ্ন থেকেই বৃক্ষের গভীর সান্নিধ্য যেমন লাভ করে এসেছে, তেমনি বৃক্ষ...

তার কৌতূহল মিশ্রিত বিস্ময়কেও উদ্রিক্ত করেছে। সে লক্ষ্য করেছে ক্ষুদ্র একটি বীজ রৌদ্রপাত ও বর্ষণের মধ্য দিয়ে কিভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিণত হয়েছে মহীরুহে। ফল, ফুল ও পুষ্পে তা পূর্ণতা লাভ করেছে। মানুষ বৃক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছে। কল্পনা করেছে তার মধ্যেকার এক অলৌকিক ক্ষমতাকে যা শেষ পর্যন্ত দেবত্বে উন্নীত হয়েছে। বৃক্ষের জীব জগতের মঙ্গল বিধানে কল্যাণকর ভূমিকা এবং তার স্থায়ীত্বও দেবত্ব অর্জনের অন্যতম কারণ। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মূলতঃ সেইসব বৃক্ষকেই বিশেষ গৌরবদান করেছে মানুষ, যেগুলি দীর্ঘস্থায়ী। এই প্রসঙ্গে আর একটি সত্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। তা হল সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন যে ফুলের সঙ্গে আমাদের রসনার যোগ, তাকে স্থান দেওয়া হয়নি, অনুরূপভাবে যে বৃক্ষ আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তিতে কিংবা রসনা পরিতৃপ্তিতে গৌরবজনক ভূমিকা পালন করে, প্রায়শঃই তাদের তেমন দেবত্বে অভিষিক্ত করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে আমরা পাকুড়, বট, অশ্বত্থ ইত্যাদির উল্লেখ করতে পারি। আম আমাদের রসনা তৃপ্তিতে অদ্বিতীয় ভূমিকা পালন করে। আম্র পল্লব যদিও পূজায় লাগে তাই বলে সামগ্রিকভাবে আম্র-বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে পূজার্চনা করা হয় না। অন্যান্য ফল-বৃক্ষ সম্পর্কেও একই কথা। ব্যতিক্রম স্বরূপ আমরা কদলী ও বিল্ববৃক্ষকে দেখতে পাই অবশ্য। তবে একথাও স্বীকার্য যে বেল ভক্ষিত হলেও তা ঠিক আম, কাঁঠাল, জাম বা পেয়ারা ফলের মত জনপ্রিয় ও অধিক ভক্ষিত ফল নয়। অর্থাৎ মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তিতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তার নেই। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে অশ্বত্থকে বলা হয় Ficus Religeosa আর বটকে বলা হয় Ficus Bengalengis। প্রথমটির ক্ষেত্রে ধর্মীয় ভাবটিকে যুক্ত করা হয়েছে,দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে অর্থাৎ বটগাছ যে মূলতঃ বাংলা দেশের, এই সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বাস্তবিক বাংলা দেশের বহুল পরিচিত গাছ হল অশ্বত্থ ও বট। দুইয়ের ক্ষেত্রেই দেবত্বের ভাব আরোপিত হয়েছে। প্রসঙ্গত বৃক্ষকে দেবত্বের মহিমায় উন্নীত করার কারণ প্রসঙ্গে মধুসূদনের 'বটবৃক্ষ' চতুর্দশপদীটি উদ্ধার করা গেল। কবিতার বক্তব্য বটবৃক্ষকে কেন্দ্র করে উপস্থাপিত হলেও আসলে যে সব বৃক্ষের ওপর আমরা দেবত্বকে আরোপ করেছি, প্রায় সাধারণ ভাবে যে সব বৃক্ষের ক্ষেত্রেই এই বক্তব্য প্রযোজ্য বলা চলে—

দেব অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে,
নাহি চাহে মনঃ মোর তাহে নিন্দা করি,

তরুরাজ ! প্রত্যক্ষতঃ ভাবত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি !
জীবকুল হিতৈষিণী, ছায়া সু-সুন্দরী,
তোমার দুহিতা, সাধু ! যবে বসুধারে
দগধে আগ্নেয় তাপে, দয়া পরিহরি,
মিহির, আকুল জীব বাঁচে পূজি তাঁরে।
শত-পত্রময় মঞ্চে, তোমার সদনে,
খেচর-অতিথি-ব্রজ, বিরাজে সতত,
পদ্মরাগ ফলপুঞ্জে ভুঞ্জি হৃষ্ট-মনে ;
মৃদু-ভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত ;
মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে !
দেব নহ ; কিন্তু গুণে দেবতার মত।

চ. বাঙলার কৃষি ও লৌকিক দেব-দেবী

এক প্রকার অনিশ্চয়তাবোধ তথা ভয় নিঃসৃত ভক্তি থেকেই দৈব নির্ভরতার উদ্ভব। আমাদের সমাজে যে অসংখ্য দেব-দেবী পূজিত হয়ে থাকেন, তাঁদের উদ্ভব যত না আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি থেকে, তদপেক্ষা ঢের বেশী প্রাক-আর্য আদিম গোষ্ঠীর বিশ্বাস সম্ভূত তাঁরা। অর্থাৎ বৈদিক দেব-দেবীর তুলনায় লৌকিক দেব-দেবীর সংখ্যাধিক্য অনেকখানি। আবার উল্লেখযোগ্য, এইসব লৌকিক দেব-দেবীদের বেশ এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃত।

বাঙালী মূলতঃ কৃষিজীবী। তার ধনোৎপাদনের সিংহভাগ কৃষি থেকেই আসে। মোট জনসংখ্যারও বেশ এক উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষির ওপরই নির্ভরশীল। এই যে চিত্র, এটা নিছক সাম্প্রতিককালের নয়। সুদূর অতীতকাল থেকেই এই চিত্র চলে আসছে। প্রচুর শস্যের উৎপত্তির জন্য ধান্যোপজীবী বাঙালীর আকুল প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে লক্ষ্মণ সেনের গোবিন্দপুর তাম্র শাসনের একটি আশীর্বাদ জ্ঞাপক শ্লোকে, প্রসঙ্গত সেটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই

শ্লোকটিতে রূপকচ্ছলে মহাদেবের জটাভারকে জলভারাবনত মেঘপুঞ্জের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে—

বিদ্যুদ্‌ যত্র মণিদ্যুতিঃ ফণি পতের্বালেন্দু রিন্দ্রায়ুধং
বারি স্বর্গতরঙ্গিনী সিতশিরোমালা বলাকাবলিঃ।
ধ্যানাভ্যাসসমীরণোপনিহিতঃ শ্রীয়াইঙ্কুরোদ্ভূতায়
ভূয়াদ্‌ বঃ স ভবার্ত্তিতাপ ভিদুরঃ শম্ভোঃ কপর্দাম্বুদঃ॥

প্রাচীন বাঙ্গালীর ইতিহাসের একেবারে আদিতে সামাজিক সম্পদের অন্যতম প্রধান উৎস ছিল কৌম কৃষি। অন্যান্য উৎসের মধ্যে ছিল শিকার এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্প। এর পরবর্তী পর্যায়ে কিছু সময়ের জন্য এদেশের অর্থনীতিতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্য। একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে বলা যেতে পারে খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-দ্বিতীয়-প্রথম শতক থেকে আরম্ভ করে ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত এদেশে ধনাগমে প্রধানতঃ উৎস ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। বিশেষতঃ চতুর্থ থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত যেন বাঙলায় 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ' এই ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছিল। কারণ এই কয়েক শতাব্দী বাঙালী উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য প্রান্তের সুবিস্তৃত অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান অংশীদার হয়ে পড়েছিল। বলাবাহুল্য, বাণিজ্যিক সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে এই কাল সীমায় তার কৃষি ও ভূমি নির্ভরতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে ধনাগমের ক্ষেত্রে এই সময়ে গৃহশিল্প এবং কৃষির যে কোনই ভূমিকা ছিল না এমন নয়। বরং পূর্বাপেক্ষা এই সময়ে বাঙ্গালী উন্নত প্রণালীর কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তনে সার্থকতা লাভ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থাৎ অষ্টম শতক থেকে বাঙলায় এবং উত্তর ভারতের সর্বত্র যেহেতু বৃহত্তর ব্যবসা-বাণিজ্যের স্রোতে ভাঁটা পড়ে, সেইহেতু বাঙালীকে পুনরায় কৃষি মুখীনতা আচ্ছন্ন করে ফেলে। ঐতিহাসিকের সোচ্চার সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করে তাই উল্লেখ করতে হয়, 'স্বল্প কয়েকটি শতাব্দী ছাড়া বাংলাদেশের ঐকান্তিক কৃষি ও ভূমি নির্ভরতা কখনও ঘুচে নাই।'[১]

অতএব এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের লৌকিক দেব-দেবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যকের কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত হবার কারণ সম্পর্কে একটু বিশদভাবে আলোকপাত করা যেতে পারে।

কৃষিকাজ অন্যান্য অনেক কাজের তুলনায় একদিকে যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেমনি অপরদিকে তা আবার অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় ভরা। কৃষিকাজে বাঞ্ছিত

সাফল্যলাভের ক্ষেত্রে প্রতি পদেই নানা প্রতিকূলতা, নানা বিপত্তির সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা। অনাবৃষ্টি হলে যেমন শস্য হানির আশঙ্কা, অতিবৃষ্টিতেও তেমনি। তারপর রয়েছে নানাবিধ কীট-পতঙ্গের আক্রমণ জনিত সমস্যা, ভূমির উর্বরতা বজায় রাখা অপর একটি সমস্যা। সর্বোপরি প্রয়োজনীয় কৃষি সরঞ্জাম সংগ্রহজনিত সমস্যা কিংবা বীজ সংগ্রহ, মহাজনের ঋণ এসব ত আছেই। শস্যের উপযুক্ত পরিমাণ ফলনের ওপর শুধু যে দেশের সমস্ত মানুষের খাওয়া নির্ভরশীল তাই নয়, এক কথায় কমপক্ষে সত্তর শতাংশ মানুষের সম্বৎসরের জীবিকা নির্ভরশীল। আগেকার দিনে যখন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি তেমন ঘটেনি, উন্নত মানের বীজ, রাসায়নিক সারের ব্যবহার, নিবিড় প্রথায় চাষ, কৃষিকাযে ব্যাপকভাবে সরকারী সাহায্য লাভ, বিদ্যুৎ চালিত পাম্প অথবা সেচ খালের মাধ্যমে কৃষি জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা, কীট নাশক বিভিন্ন প্রকার ঔষধের ব্যবহার, কৃষি বিজ্ঞানীদের নিরন্তর গবেষণা লব্ধ ফলের সহায়তা লাভের সুযোগ ছিল না,তখন সমগ্র কৃষি ব্যাপারটাই ছিল চরম অনিশ্চয়তায় পূর্ণ। বর্তমানে বিংশ শতাব্দীর ন-এর দশকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা লাভ সত্ত্বেও যখন কৃষি উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে অনিশ্চয়তা মুক্ত হতে পারে নি, সেক্ষেত্রে কয়েকশত বৎসর পূর্বেকার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। যা নাকি একান্ত প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য অথচ চরম অনিশ্চয়তায় পূর্ণ, সেই প্রয়োজনীয় বিষয়টিকে অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করতে, এককথায় নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে মানুষ কল্পনা করে নিয়েছে নানা লৌকিক দেব-দেবীর অস্তিত্ব, যাঁদের করুণায় মাঠে বাঞ্ছিত ফসল উৎপাদন সম্ভব এবং সার্থক হয়ে উঠবে। এইভাবেই কৃষি প্রধান বাংলাদেশের নানা স্থানেই কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লৌকিক দেব-দেবীর উদ্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে এক অঞ্চলের দেবতার সঙ্গে অন্য অঞ্চলের দেবতার মিল নেই। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই উদ্দেশ্য এক অর্থাৎ দেবতার করুণা লাভের মাধ্যমে মাঠে উপযুক্ত পরিমাণে ফসল লাভ।

মেদিনীপুরে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় ভীম পূজা। মধ্যম পাণ্ডব ভীম আমাদের কাছে বলশালী এবং অদ্বিতীয় যোদ্ধা রূপে পরিচিত হলেও মেদিনীপুরে কিন্তু এঁর পূজা করা হয় মূলতঃ সুকর্ষণ কামনায়। পুরুলিয়া জেলায় জ্যৈষ্ঠমাসের তের তারিখটিতে অনুষ্ঠিত হয় রহিণ পূজা। এই পূজার সঙ্গেও কৃষির ঘনিষ্ঠ যোগ। প্রচলিত বিশ্বাস হ'ল রহিণ পূজার দিন বীজ বপন করলে বীজ তোলার শস্য কোন রোগে আক্রান্ত হয় না।

তাছাড়া এইদিনটিতে বীজ বপন করলে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় বলেও ধারণা প্রচলিত।

মেদিনীপুর জেলায় ইন্দ্ পূজা উপলক্ষে শাল গাছকে 'আধাগাছ' করে সেটিকে ঘিরে পল্লীবাসী মেয়ে ও শিশুর দল নৃত্যগীতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। এই নৃত্যগীতানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হ'ল ইন্দ্রকে খুশী করে বৃষ্টি লাভ যা নাকি কৃষির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

বাঁকুড়া জেলার নানাস্থানে মকর সংক্রান্তির দিন 'মাহাদনা' নাম্নী এক লৌকিক দেবী পূজিতা হন। 'মাহাদনা' কে শস্য দেবী বলে কল্পনা করা হয়। অক্লান্ত পরিশ্রমে কৃষক যে ফসল বোনে, তা যেন কোন প্রতিকূলতার জন্য নষ্ট না হয় সেইজন্যই এই দেবীর পূজার আয়োজন। অর্থাৎ 'মাহাদনা' হলেন শস্যরক্ষা কারিণী। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আরম্ভ আমাদের আয়ত্তে কিন্তু শেষ আমাদের আয়ত্তে নহে।' কৃষির ক্ষেত্রে এর সত্যতা আমরা যেন গভীর ভাবে অনুধাবন করি। উপযুক্ত ভাবে ভূমিকর্ষণ করা সত্ত্বেও, যথাযথভাবে সার প্রয়োগ, বীজ বপন এবং জলসেচের পরেও যে ফসল মাঠকে আলোকিত করে তুলল, শেষপর্যন্ত তা যে পরিশ্রমকারী কৃষকের ঘরে উঠবেই এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। শেষ পর্যায়ে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে দেখা গেল মাঠের বোনা ফসল মাঠেই নষ্ট হল, এক্ষেত্রে হতভাগ্য নিরুপায় কৃষকের আর করার কিছুই রইল না। অর্থাৎ সেই অনিশ্চয়তার খেলা। তাই ফসল ফলানোর সঙ্গে সঙ্গে তাকে রক্ষা করে গৃহে তোলার ব্যাপারেও অসহায় কৃষককে নির্ভর করতে হয় দৈবী শক্তির অনুগ্রহের ওপর।

বাঁকুড়ায় আর একটি লৌকিক দেবী পূজিতা হন—ইনি হলেন 'বাঘরাই'। প্রতি বৎসর সাতই আষাঢ় অর্থাৎ অম্বুবাচীর দিনটি এঁর পূজার্চনার জন্য নির্দিষ্ট। বলিদানের মাধ্যমে এই দেবীকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়, যাতে অনাবৃষ্টি এবং বন্যার কবল থেকে রক্ষালাভ সম্ভব হয়। অনাবৃষ্টি যেমন অবাঞ্ছিত, তেমনিই অবাঞ্ছনীয় হ'ল বন্যা। কারণ দুই-ই কৃষির পক্ষে অনিষ্টকারী। আর সেই কারণে এই দুইয়ের হাত থেকে রক্ষালাভের জন্য অসহায় মানুষের প্রয়াস 'বাঘরাই'য়ের পূজার্চনার মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায়।

বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় ভাঁজোর পূজা। ভাঁজোও লৌকিক দেবী। ইনিও কৃষির সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। ভাঁজো উপলক্ষ্যে পাতা সরাগুলিতে যেসব শস্যবীজ দেওয়া হয়, উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন

করা হয়, যাতে সেগুলি থেকে ভালমত অঙ্কুরোদ্গম হয়। বিশ্বাস, সরার চারাগুলি ভাল হলে ক্ষেতের ফসলও হয় ভাল। এই বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যাবে নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে—

ভাজুই চারা ভাল হলে ফসল যে হয় ভাল
ভাজুই মাঝে লুকিয়ে আছে নতুন দিনের আলো।

ভাঁজোর মধ্যে আমরা যাদুবিশ্বাসের পরিচয় পাই। কারণ এই পূজায় ব্রতিনীরা কেবল ভাল ফসল পাওয়ার আশা করেই ক্ষান্ত থাকেনা, সেইসঙ্গে যা পেতে চায় তার নকল করে। মানুষের এ এক প্রাচীন বিশ্বাস যে সে যা করবে প্রকৃতিতে বাস্তবেও তাই ঘটবে। এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ প্রদত্ত একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা গেল যেখানে তিনি বলেছেন, 'মেক্সিকোতে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোয় মেয়েরা এলোকেশী হয়,—শস্য যেন এই এলোকেশের মতো গোছাগোছা লম্বা হয়ে ওঠে, এই কামনায়।'[২] আগেকার দিনে ত বটেই এমনকি এখনও পর্যন্ত নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদন কৌশল বাঞ্ছিত উন্নতি লাভ করেনি। আর যে পর্যন্ত উৎপাদন কৌশল থাকবে অনুন্নত সে পর্যন্ত মানুষকে যাদু বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতেই হবে।[৩] প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলতে হয়। অপরাপর কাজের তুলনায় কৃষিকে কেন্দ্র করেই একদিকে যেমন যাদু বিশ্বাসের দুর্বার আত্মপ্রকাশ, তেমনি যাদু বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে কৃষি কাজের অস্তিত্ব প্রায় অসম্ভব বলেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই ধারণা বর্তমান। জর্জ টম্‌সন এর কারণটি বিশ্লেষণ করে যথার্থই বলেছেন '...the work of tilling, sowing and reaping is slow, ardous and uncertain. It requires patience, fore sight, faith. Accordingly, agricultural society is characterised by the extensive development of magic.'[৪] পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম ইত্যাদি অঞ্চলে যে দুটি লৌকিক দেবী সাড়ম্বরে পূজিতা হন, তাঁরা হলেন টুসু ও ভাদু। এই দুই দেবীকেই পূজা করা হয় জমিতে উর্বরতা শক্তি লাভের জন্য। তুলনা করলে দেখা যাবে কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লৌকিক দেব-দেবীদের মধ্যে দেবীর প্রাধান্য। ভাঁজো, ভাদু, টুসু, মাহাদনা, বাঘরাই প্রভৃতি লৌকিক দেবীরাই এর প্রমাণ। আবার কৃষি সংক্রান্ত বা কৃষি সহায়ক এইসব দেবীদের আরাধনা একান্তভাবে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় মহিলাদের দ্বারা। এই ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। প্রকৃতি ও নারীকে এক্ষেত্রে আমরা সমার্থক রূপে পাই। দুইয়েরই কাজ উৎপাদন। প্রকৃতি উৎপাদন করে ফসল

আর নারী উৎপাদন করে সন্তান। উভয়েই প্রজনন ক্ষমতার অধিকারিণী। তাই ভূমির উর্বরতা শক্তির বৃদ্ধিতে, বাঞ্ছিত পরিমাণ ফসল যাতে উৎপন্ন হয় সেই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত লৌকিক দেবীর আরাধনায় নারীদের প্রাধান্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে—

'The magical or religious rites intended to secure the fertility of the fields, were naturally within the special competence of the women who cultivated them, and whose fertility was linked to the earth's. Many of the women's religious associations were doubtless concerned originally with discharging that important function.'[৫]

১. বাঙ্গালীর ইতিহাস ; ড. নীহাররঞ্জন রায় ; পৃ: ৮৩৬
(আদি পর্ব ; ২য় খণ্ড ; পঞ্চদশ অধ্যায়।)

২. লোকায়ত দর্শন ; দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পৃ: ১৫৫

৩. বাংলার ব্রত ; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; পৃ: ১২

৪. George Thomson AA 21-2.

৫. Robert Briffault 3 : 3

॥ পত্রিকা ও গ্রন্থপঞ্জী ॥

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (৩য় সংখ্যা, ১৩০১)
" (২য় সংখ্যা, ১৩১২)
" (৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩৫)
বৈদগ্ধ্য (৪র্থ বর্ষ ; ৩য় সংখ্যা ; ১৯৮২)
বীরভূমের বিবরণ (১ম ও ২য় খণ্ড) হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
বাংলার লোকসংস্কৃতি (১৯৮২) ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য।
বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব (২য় খণ্ড ; পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি প্রকাশিত ; ১৩৮৭) ড. নীহাররঞ্জন রায়।
বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার (১৩৮৭) ড. কামিনীকুমার রায়
পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা (১৩৮২) শ্রীসনৎকুমার মিত্র
বাংলা ছড়ার ভূমিকা (২য় খণ্ড, ১৩৮৫) ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক
পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (৩য় খণ্ড, ১৯৭১) অশোক মিত্র সম্পাদিত।
লোকায়ত দর্শন (১৩৬৩)—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সদুক্তি কর্ণামৃত—শ্রীধর দাস।
মধুসূদন রচনাবলী (সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, ১৯৭৪)
ধলভূমের লোকগীতি (১ম খণ্ড ; ১৯৭৮) ড. চিত্তরঞ্জন লাহা।

॥ বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় যাঁরা নানা ভাবে সাহায্য করেছেন ॥

শ্রীশৈলেন দাস ও শ্রীমোহন সিংহ (বাঁকুড়া), শ্রীনিতাই চাঁদ সাহা (বীরভূম) শ্রীরামসুনীল ঘোষ, শ্রীঅমলেশ মজুমদার ও মোশারফ হোসেন (হুগলী), শ্রীপুলকেন্দু সিংহ (মুর্শিদাবাদ), ড. রফিকুল ইসলাম (বর্ধমান), শ্রীসুভাষ দত্ত (২৪ পরগণা), শ্রীসুশান্ত হালদার ও শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় (নদীয়া), শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রভাতকুমার দাস (হাওড়া), শ্রীঅসীম হালদার, শ্রীপ্রভাত কুমার সরকার ও অধ্যাপক শ্রীলক্ষ্মণ কর্মকার (মেদিনীপুর)।